Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া রহমান তন্বি

রোলঃ 216022412

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া রহমান তন্বি

রোলঃ 216022412

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া রহমান তন্বি, আইডিঃ 216022412 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেন? " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

সুমাইয়া রহমান তন্বি

আইডিঃ 216022412

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁরই কাছে সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু তাঁর আয়ত্তাধীন এবং সবকিছু তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। তিনি এক আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَا لِيَهَا سَا فِلَهَا وَاَ مْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَا رَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَ مَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ

"তারপর আমার নির্দেশ যখন এসে গেল, তখন আমি সেই জনপদকে উপর নীচ করে উল্টে দিলাম, আর তাদের উপর স্তরে স্তরে পাকানো মাটির প্রস্তর বর্ষণ করলাম। যে প্রস্তর খন্ডের প্রতিটিই তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। যালিমদের জন্য এ শাস্তি বেশী দূরের ব্যাপার নয়।"

আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'য়ালা এক ভয়াবহ শাস্তির কথা বলেছেন। এটা ছিল হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওমের কুকর্মের উপযুক্ত শাস্তি। আল্লাহর আইন ও বিধানকে উলটে তারা স্ত্রীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিল, এই অবাধ্যতা ও কুকর্মের ফলস্বরুপ তাদের উলটে দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

কষ্টের বিষয় হল সেই ফিতনা প্রলয়ের মতো ধেয়ে আসছে পুনরায় যা কিনা প্রতিটি দেশে দেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে যার নাম ট্রান্সজেন্ডারিজম।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ দেশে প্রতিষ্ঠার জন্য জোরদার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই মতবাদ যদি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় তাহলে এর পরিণতি কি হবে তা আমাদের ধারনার বাইরে নয়। তরুণ-তরুণীরা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার দাবি করে সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একাকার হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের যুবসমাজ। মুছে যাবে মানুষের বাহ্যিক আসল পরিচয়। ভেঙ্গে যাবে পারিবারিক বলয়।

তাই, ট্রান্সজেন্ডারের ফিতনা রুখতে হলে প্রতিটা মানুষকে সচেতন হতে হবে, আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে; ঘরে, সমাজে, কর্মস্থলে, বন্ধুমহলে, চায়ের আড্ডায়, সমাবেশ ও সভায়। সর্বস্তরের মানুষের সামনে উন্মোচন করতে হবে এর চেহারা। তবেই সম্ভব হবে এই ফিতনাকে রুখে দেওয়া ইনশাআল্লাহ।

ট্রান্সজেন্ডারের পরিচয়

১.১ ট্রান্সজেন্ডার কি?

মূলত ট্র্যান্স (trans) মানে পরিবর্তন, জেন্ডার (gender) মানে লিঙ্গ। ট্রান্সজেন্ডার মানে লিঙ্গ পরিবর্তন বা রূপান্তর। এককথায় নিজের পুরুষ আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে নারী আইডেন্টিটি গ্রহণ করা বা নারী আইডেন্টিটি পরিবর্তন করে পুরুষ আইডেন্টিটি গ্রহণ করার নাম হচ্ছে 'ট্রান্সজেন্ডার'।

এক্টিভিস্টরা বায়োলজিক্যাল সেক্স বা জন্মগত লিঙ্গকে 'সেক্স' নামে পরিচিত করে আর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধের ভিত্তিতে যে লিঙ্গের পরিচয় ফুটে ওঠে তাকে জেন্ডার বা 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' নামে তুলে ধরে। অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বা মনের লিঙ্গ। আর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধের ভিত্তিতে কোনো পুরুষের নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করা বা কোনো নারীর নিজেকে পুরুষ হিসেবে প্রকাশ করা হলো জেন্ডার এক্সপ্রেশন (Gender Expression) বা মনের লিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ। [১]

বর্তমানে সমকামিতা আন্দোলন বুঝাতে বহুলভাবে প্রচারিত হয় তিনটি টার্ম বা শব্দ, যার অর্থ কার্যত একই, অর্থাৎ সমার্থক। এগুলো হচ্ছে-

- ট্রান্সজেন্ডার (Transgender যদিও এক সময় এটা আলাদা সম্প্রদায় ছিল);
- এলজিবিটিকিউ (LGBTQ) এবং
- নন-বাইনারি (Non-binary তথা প্রচলিত লিঙ্গ পরিচয়ের বহির্ভূত) ।

American Psychiatric Association (APA)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী-এই শব্দগুলো এখন আমব্রেলা (দলীয়) টার্ম হিসেবে, রাজনৈতিক শক্তি বা মতাদর্শ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ৭০৮ মোটাদাগে ট্রান্সজেন্ডার, এলজিবিটি, নন-বাইনারি, জেন্ডার ডিসফোরিয়া, জেন্ডার কুইয়ার, সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন শব্দগুলো ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে-জন্মগত লিঙ্গ-পরিচয়কে অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছেমতো জেন্ডার-পরিচয় তথা সমকামিতাকে প্রমোট করা। প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো মতবাদ নয়, বরং ভয়াবহ এক ফিতনা।

ট্রান্সজেন্ডার-সংক্রান্ত শব্দগুলোর প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হওয়া প্রসঙ্গে Annual Review on Law and Social Science নামক জার্নালে David Frank and Nolan Phillips উল্লেখ করেন,

"The expansion of sexuality in society is self-reinforcing. The legitimation of each new identity endangers others. Thus, the old gay center on campus morphs into the lesbian and gay center, and then the LGB center, then the LGBT center and then the LGBTQ center, and at some point the LGBTQI center, and now even the LGBTQQIAAP center (lesbian, gay, bisexual, transgendered, queer, questioning, intersex, asexual, allies and pansexual)" [২]

১.২ সংক্ষেপে এল জি বি টি

এল জি বি টি-এটি মূলত চারটি বাক্যের সংক্ষিপ্তরূপ। এখানে লুকিয়ে আছে ঘৃণিত চরিত্র ও কুৎসিত চিন্তার বহর, যা কোনো সুস্থ ও বিবেকসম্পন্ন মানুষের রুচি বা চিন্তা হতে পারে না। আর সেই চিন্তার স্বাভাবিকীকরণের জন্য নতুন রূপে ট্রান্সজেন্ডারিজমকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। LGBT বা GLBT একটি নাম-আদ্যাক্ষর। ৯০ এর দশক থেকে এই আদ্যাক্ষরটি পূর্বতন 'গে কমিউনিটি'র সংজ্ঞাবাচক নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সামগ্রিকভাবে এলজিবিটি বলতে বোঝায়, L লেসবিয়ান, G= গে, B = বাইসেক্সুয়াল এবং T = ট্রান্সজেন্ডার। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী।'

একটু ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে এখানে মোট চারটি অক্ষর রয়েছে। প্রতিটি অক্ষর মূলত একেকটি মতাদর্শ লালন করে। যথা:

১. 'লেসবিয়ান'- এই শব্দ দ্বারা মূলত এমন নারীকে বোঝানো হয়, যে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। পুরুষের প্রতি তার আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না।

২. 'গে'- এই শব্দ দ্বারা এমন পুরুষকে বোঝানো হয়, যে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত। নারীর প্রতি তার কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না।

৩. 'বাইসেক্সুয়াল'- এই শব্দ দ্বারা এমন নারী বা পুরুষকে বোঝানো হয়, যারা নারীপুরুষ উভয়ের প্রতি সমানভাবে আসক্ত। নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গের প্রতি তাদের বিশেষ কোনো আকর্ষণ নেই।

৪. 'ট্রান্সজেন্ডার'- ট্রান্সজেন্ডার বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়, যে নিজের জন্মগত লিঙ্গে আত্মপ্রকাশ করতে অপছন্দ করে এবং সার্জারি বা হরমোন থেরাপির মাধ্যমে কিংবা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধের ভিত্তিতে নিজেকে ভিন্ন লিঙ্গে আইডেন্টিটি করতে চায়।

সেই হিসেবে সম্পূর্ণ সুস্থ একজন পুরুষ নিজেকে 'মনে হলেই' মেয়ে বলতে পারবে এবং একজন সম্পূর্ণ সুস্থ নারী 'মনে হলে'ই নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করতে পারবে।

এই পুরো মতবাদকে তারা সংক্ষেপে 'এল জি বি টি' নামে প্রকাশ করছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা এই মতবাদ বুঝাতে বিশেষ একটি আইকন ব্যবহার করে থাকে, যা রংধনু মিশ্রিত পতাকা হিসেবে আমরা দেখতি পাই, যেটাকে 'সিক্স কালার রেইনবো ফ্ল্যাগ' বা ছয় কালারের রংধনু মিশ্রিত পতাকা বলা হয়। ৮০ দশকের মধ্য থেকে শেষ ভাগের মধ্যে গে কমিউনিটির পরিবর্তে 'এলজিবি' আদ্যাক্ষরটির ব্যবহার চালু হয়। এরপর ৯০ এর দশকে 'এলজিবিটি' আদ্যাক্ষরটি গৃহীত হয়। তবে এই আদ্যাক্ষরটি সমাজের সংশ্লিষ্ট অংশের অনেকেরই সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়।

তথ্যসূত্র [৩]

১.৩ ট্রান্সজেন্ডারিজম এক্টিভিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি

ট্র্যান্সজেন্ডারিজম এক্টিভিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ট্র্যান্স মতবাদে বিশ্বাসীরা তাদের অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য চারটি ধারণাকে তুলে ধরে:

১. বায়োলজিক্যাল সেক্স (Biological Sex) বা জন্মগত লিঙ্গ।

২. সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বা প্রণয়বোধ ও যৌন আকর্ষণ।

৩. জেন্ডার (Gender) বা লিঙ্গ।

৪. জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ।

ট্রান্সজেন্ডারিজমে বিশ্বাসীরা বলে, এই চারটি জিনিস আলাদা। তারা যেভাবে এই চারটিকে সংজ্ঞায়িত করে সংক্ষেপে তা জেনে নেওয়া যাক। তারা বলে,

১. বায়োলজিক্যাল সেক্স (Biological Sex) বা জন্মগত লিঙ্গ মানে হলো স্রেফ দেহের বর্ণনামাত্র এবং মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য। যেমন ক্রোমোজোম যৌনাঙ্গ হরমোন ইত্যাদি মিলে তার জন্মগত লিঙ্গ ঠিক হয়। কিছু মানুষের পুরুষাঙ্গ থাকে, কিছু মানুষের যোনিপথ থাকে। কিন্তু এগুলো দিয়ে কিংবা দেহবায়বের মাধ্যমে মানুষের পরিচয় নির্ণয় হয় না।

২. সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বা প্রণয়বোধ মানে হলো, মানুষের যৌন রুচি বা আকর্ষণ। যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এক্ষেত্রে ভালোমন্দ, ভুল কিংবা সঠিক বলে কিছু নেই। কেউ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। কেউ আকৃষ্ট হতে পারে উভয় লিঙ্গের প্রতি। আবার কারও মধ্যে যৌনতার আকাঙ্ক্ষা বলতে কিছুই নাও থাকতে পারে। যৌন রুচি একটা বর্ণালির মতো। এখানে আছে অনেক রং। পুরুষ হলেই নারীর প্রতি বা নারী হলেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধ থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

৩. জেন্ডার (Gender) বা লিঙ্গ। আর তা হলো, নারী বা পুরুষ হবার সাথে যুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা। সমাজ ও সংস্কৃতি নারীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আচরণ আশা করে, ভিন্ন ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে পুরুষের কাছ থেকে। নারী ও পুরুষের কেমন হওয়া উচিত, এ-ব্যাপারে সমাজের নির্দিষ্ট কিছু ধারণা থাকে। সে ভিত্তিতে সমাজে গড়ে

ওঠে লিঙ্গের পরিচয়। কিন্তু এই ধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মানুষের বানানো, তা সর্বজনীন কিছু নয়।

সুতরাং জেন্ডারও একটি বর্ণালির মতো। নারী বা পুরুষ হবার নির্দিষ্ট কোনো রুলস নেই। কেউ নিজেকে নারী কিংবা পুরুষ দুটোই বা কোনোটাই না অথবা এ দুইয়ের মাঝামাঝি কোনো কিছু হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। সবই সমান। সবই বৈধ। এটাই মানুষের অধিকার।

৪. জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ অথবা 'মনের লিঙ্গ'। এর মানে হলো নিজের ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি। কারও দেহ পুরুষের হতে পারে, কিন্তু সে নিজেকে নারী মনে করে এবং নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সে নারীসুলভ আচার-আচরণ ও নাম ব্যবহার করে, পোশাক পরে ইত্যাদি। সুতরাং এভাবে নিজেকে নারী মনে হওয়ার বিষয়টি হলো মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বা জেন্ডার আইডেন্টিটি।

আর নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করা হলো জেন্ডার এক্সপ্রেশন (Gender Expression) বা মনের লিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।

একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে, পরিবার সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম তাকে সেটাই গণ্য করবে। অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গের উপর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ প্রাধান্য পাবে। তাই পুরুষাঙ্গ থাকলেও কেউ 'নারী' হতে পারে, যোনিপথ থাকলেও কেউ 'পুরুষ' হতে পারে।

১.৪ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের ভিন্নতা

ট্রান্সজেন্ডারিজমের কথা শুনলেই অধিকাংশ মানুষ মনে করেন এটা হয়তো বা হিজড়াবাদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এ দুটো জিনিস একেবারেই আলাদা এবং বিপরীত প্রসঙ্গ। আসুন, জাগতিক ও শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক।

মানুষ হয় পুরুষ অথবা নারী। যাদের দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে, তারা পুরুষ। যাদের দেহ ডিম্বাণু উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে, তারা নারী।

খুব অল্প সংখ্যক মানুষ প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাহ্যিকভাবে তাদের দেহে জন্মগতভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায়।

একটি শিশুকে জন্মের সময় বাহিক্যকভাবে মেয়ে মনে হয়েছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় দেখা গেল তার মাসিক হচ্ছে না। তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল তার জরায়ু নেই। বরং শরীরের ভেতরে অণ্ডকোষ আছে। তার শরীরের ভেতর পুরুষের হরমোন সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি একজন ইন্টারসেক্স পুরুষ, যার শরীরে বাহিক্যকভাবে নারীসুলভ কিছু চিহ্ন আছে।

নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইন্টারসেক্স নন। তাদের জন্ম হয়েছে সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু একটা সময়ে এসে নিজেকে 'মনে হওয়া'র ভিত্তিতে তারা বিপরীত লিঙ্গ মনে করে বা পরিচয় দেয়। তাদের দাবি হলো, মানুষের যৌনাঙ্গ তার লিঙ্গ নির্ধারণ করে না, বরং লিঙ্গ বা জেন্ডার একটি সামাজিক ধারণা। যে নিজেকে যেই জেন্ডার ভাবে, সে তা-ই। বাস্তবে লিঙ্গ যাই হোক।

অনেকে সার্জারি বা হরমোন ট্রিটমেন্ট করে পরবর্তীতে নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করে। যদিও সার্জারির পরও কার্যত বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য অর্জন কখনও সম্ভব নয়। একজন ট্রান্সনারী গর্ভধারণে অক্ষম এবং ট্রান্সপুরুষ বীর্যপাতে অক্ষম। শুধু বাহ্যিক অঙ্গের গঠন সার্জারি করে বসিয়ে দেওয়া হয়।

পশ্চিমারা হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডারকে একটা মতবাদে রূপ দেওয়ার কারণে আজ এই বিকৃত চিন্তা ও রুচির নাম দেওয়া হয়েছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ। কিন্তু এটা আর পশ্চিমে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমাদের দেশেও আমদানি করা হয়েছে এবং একে আইনি ভিত্তি দেওয়ার জোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই মতবাদের প্রথম ধাপ হলো, কোনো পুরুষের যদি নিজেকে নারী মনে হয়, তা হলে সে একজন নারী। সেই পুরুষ শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হোক, সন্তানের জনক হোক, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

একইভাবে কোনো নারীর যদি নিজেকে পুরুষ মনে হয়, তা হলে সে পুরুষ। যদিও সে গর্ভধারণে সক্ষম এবং নারীর সকল বৈশিষ্ট্য তার মাঝে বিদ্যমান। শুধু 'মনে হওয়া'র উপর ভিত্তি করে আজ একটা অভিশপ্ত মতবাদ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা স্কুলগুলোতে আজ এই মতবাদেরই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশেও এই চিন্তা আমদানি হয়ে গেছে।

এই মতবাদের চূড়ান্ত ধাপ হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন থেকে বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়া। আল্লাহপ্রদত্ত দানের উপর নাখোশ হয়ে একজন পুরুষের সার্জারির মাধ্যমে নারীতে রূপান্তরিত হওয়া কিংবা একজন নারীর সার্জারির মাধ্যমে পুরুষে রূপান্তরিত হওয়া।

একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষ এই ইতিবৃত্ত শুনেই বুঝতে পারছে, এই চিন্তা কতটা বীভৎস, কত কুৎসিত, কতটা কুরুচিপূর্ণ এবং ইসলামি শরিয়ত এমন চিন্তাকে কখনও সমর্থন করে না।

মূলত এই আন্দোলনের পেছনে রয়েছে আরেক জঘন্য যৌনাচারকে প্রচারের চেষ্টা। সেটা হলো সমকামিতা।

হিজড়াদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আল্লাহ তাআলার দেওয়া। সেখানে তাদের নিজেদের কোনো হাত নেই। অপরদিকে ট্রান্সজেন্ডারদের শারীরিক কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। তাদের দাবির ভিত্তি হলো প্রতারণা ও পাশবিক প্রবৃত্তির অনুগামিতা।

১.৫ ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়ার পার্থক্য

নিম্নে ইসলামি শরিআ'তের পরিভাষায় খুনসা বা হিজড়া ও প্রচলিত ট্রান্সজেন্ডারের মৌলিক পার্থক্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো:

১. জন্মসূত্রে পার্থক্য:

হিজড়া মানে জন্মগত ত্রুটিযুক্ত লিঙ্গবিশেষ, যা ল্যাবটেস্ট করে জেনেটিক সমস্যার বিষয়টি প্রমাণ করা যায় এবং শরয়ি নীতিমালার আলোকে নারী-পুরুষ নির্ধারণ করা যায়। সাথে সাথে ইহ-পরকালীন সকল সমস্যার শরয়ি সমাধান লাভ করা যায়।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারিজম সম্পূর্ণ তার বিপরীত এক বিষয়। এটি মানসিক অবস্থা বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ, যার সাথে জন্মগত লিঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই। এই বিষয়কে ল্যাবটেস্ট করে প্রমাণ করা যায় না। স্বঘোষিত পরিচয় (self-identified) ধারণ করে সে 'ভুল দেহে' আটকা পড়েছে বলে মনে করে।

২. পরিসংখ্যানগত পার্থক্য:

হিজড়া হয়ে জন্মগ্রহণ করা খুবই অস্বাভাবিক ও বিরল ঘটনা। প্রতি ৫ হাজার মানুষের মধ্যে একজন হিজড়া হতে পারে। জন্মগতভাবে হিজড়া হওয়ার বিষয়টি প্রাকৃতিক বা খোদাপ্রদত্ত সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারদের জন্মগত কোনো সমস্যা থাকে না। ট্রান্সজেন্ডারিজমকে বৈধতা দেওয়া হলে বিপুল সংখ্যক লেবাসধারী বিপরীত লিঙ্গের পরিচয় ধারণ করে নেবে। তখন রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যানে বিরাট জটিলতা দেখা যাবে।

৩. যেকোনো কালে শারীরিক গঠনে পরিবর্তন হওয়ার বিবেচনায় পার্থক্য:

একজন হিজড়া হওয়া শিশু প্রজননগত বাহ্যিক অস্পষ্ট অঙ্গ নিয়ে জন্মাতে পারে। অথবা কোনো মানুষ বয়ঃসন্ধি, এমনকি ২০/২৫ বছর বয়সেও শারীরিক গঠনে পরিবর্তন ঘটে (অসুস্থতা জনিত কারণে) হিজড়া হয়ে যেতে পারে।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারদের কোনো কালে শারীরিক গঠনে পরিবর্তন হয় না। না জন্মকালে, না শিশুকালে, না বয়ঃসন্ধিকালে। বরং একটা সময় মানসিক অসুস্থতার চূড়ান্ত পর্যায়ে

উপনীত হয়ে তারা ইচ্ছকৃতভাবে হরমোন থেরাপি কিংবা সার্জারি করে বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করে।

৪. লিঙ্গের ত্রুটি বা লিঙ্গ পরিবর্তন মুখ্য বিষয় হওয়ার বিবেচনায় পার্থক্য:

হিজড়া মানেই হলো, যাদের জন্মগত লিঙ্গ ত্রুটিযুক্ত। তাদের শারীরিক গঠন ও চাল-চলনে কিছুটা অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রে তাদের কোনো ঐচ্ছিক অবস্থান থাকে না। বরং পুরো বিষয়টাই জন্মগত।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে শুধু 'দাবি করা' ও 'নাম পরিবর্তন'ই যথেষ্ট, চাই হরমোন থেরাপি বা সার্জারির পদ্ধতি গ্রহণ করুক বা না করুক। যেমন: তারা নিজেদের নামের ধরন বদলে ফেলে, পোশাক পরিবর্তন করে, মেকআপ করতে শুরু করে, মেয়েদের মতো লম্বা করে চুল রাখে ইত্যাদি। অর্থাৎ তাদের কাছে মুখ্য বিষয় হলো মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বা 'মনে হওয়া'র ভিত্তিতে লিঙ্গের আইডেন্টিটি তৈরি করা, যা সম্পূর্ণই তাদের ইচ্ছাধীন বিষয়।

৫. লিঙ্গনিরূপণ সময়সাপেক্ষ হওয়ার বিবেচনায় পার্থক্য:

অর্থাৎ হিজড়াদের কেউ কেউ অবিকল মেয়ে হয়ে বড় হতে থাকে। কিন্তু বড় হওয়ার পর এমনকি বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও যখন দেখা যায় তার ঋতুস্রাব হচ্ছে না, তখন বোঝা যায় আসলে সে লিঙ্গপ্রতিবন্ধী বা হিজড়া। সুতরাং এক্ষেত্রে তার লিঙ্গনিরূপণে বেশ সময় লেগেছে। পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে জন্মসূত্রেই এটা নিরূপণ একদম সম্ভব যে, সে কি পুরুষ নাকি নারী? তার লিঙ্গ নিরূপণ সময়সাপেক্ষ হয় না। কেননা সে জন্মগতভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক একজন মানুষ।

৬. ব্যক্তি কর্তৃক লিঙ্গ পরিবর্তনের বিবেচনায় পার্থক্য:

মানুষের যৌনাঙ্গে ত্রুটি থাকলেই তাকে হিজড়া বা লিঙ্গপ্রতিবন্ধী বলা হয়। পক্ষান্তরে লিঙ্গে কোনো ত্রুটি নেই, বরং হরমোন থেরাপি কিংবা সার্জারি করে লিঙ্গ ট্রান্স করা বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধের ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করাই হলো ট্রান্সজেন্ডারিজমের মূল কথা। সার্জারি করে সত্যিকার অর্থে জরায়ু বানানো যায় না, যা সন্তানধারণের সক্ষমতা রাখে। এবং কার্যকরি পুরুষাঙ্গও তৈরি করা যায় না, যা সন্তান জন্মদানে ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. জন্মগতভাবে সন্তান প্রজননে সক্ষমতার বিবেচনায় পার্থক্য:

হিজড়ারা জন্মসূত্রেই লিঙ্গপ্রতিবন্ধী হওয়ায় সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে তারা অক্ষম। পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডার হরমোন থেরাপি কিংবা সার্জারির আগে সন্তান জন্মদানের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে প্রাকৃতিক যোগ্যতা রাখে। এমনকি সার্জারির পরেও অনেকের সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে।

৮. ৯৫% ট্রান্স অকার্যকরি হওয়ার বিবেচনায়:

গবেষণায় দেখা গেছে ট্রান্সজেন্ডারের দাবিদারদের কেবল ২০% মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করে বাহ্যিক নারী বা পুরুষের মতো কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেও বাস্তবে ১৮% ট্রান্সনারীর পুরুষাঙ্গ থাকে। তেমনিভাবে ট্রান্সপুরুষের যোনি থাকে। পক্ষান্তরে হিজড়াদের বিষয়টা এমন নয়। বরং তাদের প্রতিবন্ধকতা জন্মসূত্রে এবং আল্লাহপ্রদত্ত।

৯. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য:

হিজড়া বা লিঙ্গপ্রতিবন্ধী যারা, তাদের মন্দ কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে না। বরং তারা মনে করে এটা জন্মগত বিষয়, তাকদিরের ফয়সালা। তারা সেটা হাসিমুখে মেনে নেয়।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডার মূলত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে নিজেকে সেই রকম কল্পনা করতে থাকে এবং সমকামে জড়িয়ে পরে। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা যেতে পারে, বিকৃত যৌনচার চরিতার্থকরণ এবং অন্যান্য।

১০. ইসলামি আইন বা শরয়ি বিধানগত পার্থক্য:

হিজড়া সাধারণ হোক চাই জটিল, তাদের রয়েছে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় বিষয়ে ইসলামি শরিয়ত-ভিত্তিক জীবনবিধান। কুরআন-সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত ও শরয়ি কিয়াসে রয়েছে তাদের জন্ম থেকে মৃত্যুপরবর্তী মিরাসনীতির মতো সুস্পষ্ট বিধানাবলি।

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারিজম হল এক মানসিক অসুস্থতা, যার বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় কোনো ভিত্তি নেই। তার ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহ- পরকালীন যাবতীয় ক্ষেত্রে শরয়ি দিক-নির্দেশনা সেটাই হবে, যা একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার দাবি করে এমন ব্যক্তি যদি পুরুষ হয়, সেক্ষেত্রে পুরুষের যাবতীয় বিধান এবং এমন ব্যক্তি যদি নারী হয়, সেক্ষেত্রে নারীর যাবতীয় শরয়ি বিধান তার ওপর প্রযোজ্য হবে। হিজড়াদের ন্যায় তার জন্য ভিন্ন কোনো আইন থাকবে না।

তথ্যসূত্র [৩]

রুপান্তরের বাস্তব উদাহরণ

২.১ সেইজ লিলি ব্লেয়ার

সেইজ লিলি ব্লেয়ার। বয়স দুই হবার আগেই ছয় ছয়টা পালক পরিবারে হাতবদল হতে হয় অনাথ মেয়েটাকে। শেষমেশ ঠাঁই মেলে দাদা-দাদির ঘরে। অ্যামেরিকার দক্ষিণে, পাহাড়ঘেরা ভার্জিনিয়ার সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো ছোট্ট এক শহরে। বুড়ো-বুড়ির কাছে ভালোই বেড়ে উঠছিল সেইজ। ভালো ছাত্রী ছিল, অবসরে কবিতা লিখত, ভালোবাসতো পিয়ানো বাজাতে। তবে জীবনের আরেকটা দিক ছিল ওর। ডিপ্রেশন, সেলফ হার্ম, ইটিং ডিসঅর্ডার, অনেক সময় হ্যালুসিনেশন-ছোটবেলা থেকেই নানা মানসিক সমস্যা ওকে তাড়া করে বেড়াতো। জ্ঞান হবার আগেই দেখে ফেলা পৃথিবীর নিষ্ঠুর চেহারাটা হয়তো গভীর ক্ষত একে দিয়েছিল ওর মনে। সেইজ বুদ্ধিমান, কিন্তু ভঙ্গুর। ঐ যে কাঁচের জিনিসপত্রের প্যাকেটে লেখা থাকে না, 'হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার' কথাটা ওর সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

সেইজ তখন ক্লাস এইটে পড়ে। একদিন বাড়ি ফিরে দাদিকে অদ্ভুত সব কথাবার্তা শোনালো -সব মেয়ে নাকি আসলে সমকামী, উভকামী অথবা 'নারীদেহের ভেতরে আটকা পড়া পুরুষ'। স্কুলে টিচার আর বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছে ও। কথাগুলো কতটুকু বুঝলো কে জানে, তবে ও পালটে গেল। পরের বছর থেকে স্কুলে নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দেওয়া শুরু করলো। বললো, ওর নাম এখন থেকে 'ড্র্যাইকো'। নামটা সম্ভবত হ্যারি পটারের বই বা কোনো কমিক বুক থেকে বাছাই করা। ব্যাপারটা বাড়িতে জানালো না সেইজ।

স্কুল কর্তৃপক্ষ বিনা প্রশ্নে মেনে নিলো ওর কথা। ক্লাসের খাতাপত্রে ওর নাম পালটে 'ড্র্যাইকো' লেখা হলো। এ নামেই ওকে ডাকতে শুরু করলো টিচাররা। স্কুলের কাউন্সেলর বুদ্ধি দিল, এখন থেকে ওর ছেলেদের টয়লেট ব্যবহার করা উচিৎ। সেইজের দাদা-দাদি ঘুণাক্ষরেও কিছু জানলো না। সেইজ তো জানায়নি, স্কুল থেকেও ওর দাদা-দাদিকে কিছুই বলা হলো না।

অ্যামেরিকার হাই-স্কুলগুলোতে অনেকেই প্রচণ্ড বুলিয়িং এর শিকার হয়। যারা একটু লাজুক, একটু অমিশুক, তাদের সাথে ব্যাপারটা বেশি ঘটে। সেইজ তীব্র বুলিয়িং এর শিকার হলো স্কুলে। বুলিয়িং ওর জীবনটা নরক বানিয়ে ফেললো। ছেলেদের বাথরুমে ভয়ংকর গালিগালাজ শুনলো ও, অনেকে গায়ে হাত দিল। একদিন দেয়ালের সাথে চেপে ধরে কয়েকজন ওকে শাসালো, 'আবার তোকে ছেলেদের টয়লেটে দেখলে এখানেই রেইপ করবো'।

পরে সেইজ ওর দাদিকে জানাবে, ছেলেদের টয়লেটে যাবার কোনো ইচ্ছাই ওর ছিল না। ব্যাপারটা নিয়ে তীব্র ভয় কাজ করতো ওর মধ্যে। কিন্তু স্কুলের কাউন্সেলর বারবার জোর দিয়ে বলছিল- 'ড্র্যাইকো', তুমি যেহেতু নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দিচ্ছ, তাই তোমার উচিৎ ছেলেদের টয়লেট ব্যবহার করা।

গালিগালাজ, হুমকি, আর তীব্র আতঙ্ক খুব বেশিদিন নিতে পারলো না সেইজ। বাড়ি থেকে পালালো ও। এক বন্ধুর সাথে মিলে পরিকল্পনা করলো। ছেলেটার বয়স ষোলো, অনলাইনে পরিচয়। সেইজের মতো সে-ও নাকি স্কেইটবোর্ডিং ভালোবাসে। পালাবার বুদ্ধিটা প্রথম তার মাথাতেই এসেছিল। অদেখা বন্ধুর ওপর ভরসা করে ২০২১ এর অগাস্টের ২৫ তারিখ রাতে ঘর ছাড়লো সেইজ। জীবনের কেবল ১৪ টা বসন্ত পার করা সেইজ একবারের জন্যেও টের পেল না পরবর্তী ছয়মাস (নাকি বাকি জীবন?) ওকে কীসের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

সেইজের বন্ধু মিথ্যা বলেছিল। তার বয়স ষোলো নয়। স্কেইটবোর্ডিং নিয়েও আগ্রহ ছিল না তার। যৌন নির্যাতনের দায়ে জেল খাটা দাগী আসামী সে। কারাগারের নথিতে ওর ব্যাপারে লেখা- নাম, কেনেথ ফিশার। বয়স, ছত্রিশ। অনলাইনে অল্প বয়সী মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘর থেকে বের করে আনতে ওস্তাদ এই লোক।

সেইজকে কিডন্যাপ করে ভার্জিনিয়া থেকে প্রথমে ওয়াশিংটন, তারপর বাল্টিমোরের মেরিল্যান্ডে নিয়ে যায় ফিশার। জায়গাটা ভার্জিনিয়া থেকে দুশো দশ মাইল দূরে। একটা বদ্ধ ঘরে আটকে রেখে সেইজকে ধর্ষণ করে ফিশার, তারপর টাকার বিনিময়ে ওকে তুলে দেয় আরও অনেকের কাছে। উপুর্যপরি ধর্ষণ আর গণধর্ষণের শিকার হয় সেইজ। অপহরণের এক সপ্তাহ পর কেনেথ ফিশারের বাড়ির তালাবদ্ধ রূম থেকে এফবিআই ওকে উদ্ধার করে।

দুঃস্বপ্ন এখানেই শেষ হবার কথা ছিল। উচিৎ ছিল। কিন্তু হলো না। ওকে পাওয়া গেছে জানার পর সারা রাত গাড়ি চালিয়ে মেরিল্যান্ড এসে পৌঁছলো দুশ্চিন্তায় পাগল হতে বসা দাদা-দাদি। কিন্তু সেইজকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো না। উলটো বুড়োবুড়িকে তলব করা হলো কোর্টে। সেখানে তারা জানতে পারলো মেরিল্যান্ড নগর কর্তৃপক্ষ শিশু নির্যাতনের মামলা করেছে তাদের বিরুদ্ধে। কর্তৃপক্ষের ধারণা-দাদা- দাদির 'নির্যাতনের' হাত থেকে বাঁচতেই বাড়ি থেকে পালিয়েছে সেইজ। ওকে তাদের কাস্টডিতে দেওয়া হবে না। আপাতত রাখা হবে একটা কিশোর সংশোধনাগারে!

কোর্টরুমে বসে বিস্ফোরিত চোখে সেইজের দাদি শুনলেন, তার পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, ৪৫ কেজি ওজনের, ধর্ষকের কবল থেকে সবেমাত্র ছাড়া পাওয়া নাতনিকে কিশোর অপরাধীদের সাথে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিচারক!

কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হলো সেইজকে। চারপাশে বেপরোয়া উঠতি বয়সের ছেলের মাঝখানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ে। আবারও ধর্ষিত হলো ও। পরিচিত হলো ড্রাগসের সাথেও। দু মাস কাটাবার পর নভেম্বরের ১২ তারিখ আবারও পালালো ভীতস্বন্ত্রস্ত এবং বিধ্বস্ত সেইজ। এবং আবারও কিডন্যাপড হলো। এইবার অপহরণের পর মেরিল্যান্ড থেকে অপহরণকারী ওকে নিয়ে গেল টেক্সাসের ডালাসে। একটা বদ্ধরুমে না খাইয়ে রাখলো দিনের পর দিন। পেটালো। নেশাগ্রস্থ করে পর্নোগ্রাফি বানালো। ওর শরীর বিক্রি করলো।

এমন অবস্থা থেকে অনেকেই আর ফিরে আসে না। খোঁজ পাওয়া যায় না তাদের। সমাজের অন্ধকার ছায়ার ভেতরে হারিয়ে যায় তারা। তবে সেইজকে খুঁজে পাওয়া গেল। দ্বিতীয়বার অপহৃত হবার আড়াই মাস পর ওকে উদ্ধার করা হলো ডালাস থেকে।

তারপর?

সেইজ এখন রোগী হিসেবে ভর্তি একটা মানসিক হাসপাতালে। এখানেই কাটাতে হবে কমসেকম আগামী এক থেকে দুই বছর। তীব্র ট্রমা আর পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসর্ডারে ভুগছে ও। এই হাসপাতালেও কাউন্সেলররা ওকে 'ড্রাইকো' নামে ডেকে যাচ্ছে। জোরাজুরি করছে অপারেশন করে ওর শরীরের ওপরের অংশটা ছেলেদের মতো করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু সেইজ তা চায় না। দাদিকে ও লুকিয়ে লুকিয়ে বলে, ও আসলে ছেলে না, ও মেয়ে। ওর নাম সেইজ।

সেইজ ব্লেয়ারের ঘটনায় সবচেয়ে দুঃখজনক দিক কোনটা জানেন? এ ঘটনাগুলো ঘটারই কথা ছিল না। সবকিছু খুব সহজে এড়ানো যেত। পুরো ঘটনাপ্রবাহে এমন অনেকগুলো জায়গা ছিল, যেখানে থামিয়ে দেওয়া যেত এই ভয়াবহ ব্যাপারটা।

কেন স্কুলের ক্লাসরুমে শেখানো হলো সব মেয়ে সমকামী, উভকামী অথবা ট্র্যান্স? কিশোরী মেয়েদের মনে কেন এ ধারণা বদ্ধমূল হলো? মানসিক সমস্যায় ভোগা একটা কিশোরী মেয়ে নিজেকে ছেলে বলে পরিচয় দেওয়া মাত্র কেন তা মেনে নিলো স্কুল কর্তৃপক্ষ? কেন তার পরিবারকে জানানো হলো না? কোন বিবেচনায় স্কুল কাউন্সেলর একটা মেয়েকে ছেলেদের টয়লেট ব্যবহার করতে বললো? গণধর্ষণের শিকার কিশোরীকে কেন কিশোর সংশোধনাগারে পাঠানো হলো?

শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক, স্কুল কর্তৃপক্ষ, প্রশাসন, আইন, আদালত-সেইজ ব্লেয়ারের জীবনে ঘটে যাওয়া এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারিগর হিসেবে কাজ করেছে প্রত্যেকে। এদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ছিল সেইজকে রক্ষা করা। কিন্তু তারা করেছে উল্টোটা। যেকোনো সুস্থ, বোধ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল, প্রতি পদে পদে বিপরীতটা করেছে তারা।

লুইস ক্যারলের বিখ্যাত বই অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডে কোনো কিছুই স্বাভাবিক নিয়মমতো হয় না। নুড়ি পাথর কেক হয়ে যায়, শুঁয়োপোকা হুক্কা খায়, কচ্ছপ করে দুঃখবিলাস, ছোট্ট শিশু হয়ে যায় শূকরছানা আর আজব দেশের রানী বিচারের সময় বলে দেয়-শাস্তি আগে, রায় পরে! অদ্ভুতুড়ে এক জগত। সেইজের গল্পটা শুনলে মনে হয়, আমরা যেন পথ ভুলে

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মতো কোনো এক জগতে ঢুকে পড়েছি। যেখানে কোনো কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে হয় না। তবে এই জগৎ মজার না, ভয়ঙ্কর বিভীষিকার।

বিভীষিকার এ জগৎ তৈরি হয়েছে একটা মৌলিক ভ্রান্তির ওপর। একজন মানুষের যখন মনে হচ্ছে সে বিপরীত লিঙ্গের, সে 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে'-সেই বিকারকে তখন সত্য বলে মেনে নেওয়া হচ্ছে। আইনি ও প্রশাসনিকভাবে। অনেক লম্বা সরল অংকের একটা লাইনে যদি যোগের বদলে বিয়োগ চিহ্ন বসে, অ্যালজেব্রার একটা লাইনে যদি চলে আসে ভুল চলক, তাহলে পাতার পর পাতার হিসেব নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি এই বিধ্বংসী বিকারকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার কারণে এলোমেলো হয়ে গেছে শিক্ষা, স্কুল, আইন, আদালত, প্রশাসন, মিডিয়া-সব কাঠামো। নিজ নিজ ভূমিকা পালনের বদলে এই কাঠামোগুলো তখন উলটো বিপর্যয় ডেকে এনেছে। কিন্তু 'ভুল দেহে আটকা পড়ার' এই ধারণা এলো কোথা থেকে? আর কীভাবেই-বা নিয়ন্ত্রণ গেড়ে বসলো সমাজ ও রাষ্ট্রের সব স্তরে?

২.২ সংক্রমণ

অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে পশ্চিমা বিশ্বের ওপর রাজত্ব কায়েম করেছে অদ্ভুত এক মতবাদ। এ মতবাদের নাম 'ট্রান্সজেন্ডারবাদ' (Transgenderism) অনেকে একে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা লিঙ্গ পরিচয় মতবাদও বলে থাকেন।

এই মতবাদ বলে-কোনো পুরুষের যদি 'নিজেকে নারী বলে মনে হয়', তাহলে সে একজন নারী। সমাজ ও আইন নারী হিসেবেই তাকে বিবেচনা করবে। সেই পুরুষ শারীরিকভাবে স্বাভাবিক হোক, তিন বাচ্চার বাপ হোক, কিচ্ছু আসে যায় না তাতে। কোনো নারীর নিজেকে যদি পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। যদিও তার মাসিক হয়, সে গর্ভবতী হয়, শারীরিকভাবে সে হয় ১০০% সুস্থ। নিজেকে পুরুষ মনে করা নারী যদি সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে সেটা এই মতবাদের ভ্রান্তির প্রমাণ না। বরং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের চোখে এটাই প্রমাণ করে যে, 'পুরুষও সন্তান জন্ম দিতে পারে'!

এই মতবাদ অনুযায়ী কোনো বালকের যদি 'মনে হয়' সে বালিকা অথবা কোনো বালিকার যদি মনে হয় সে বালক, তাহলে 'মনে হওয়া'র ভিত্তিতে চাহিবামাত্র হরমোন ট্রিটমেন্ট আর

বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে কাটাকুটি করে নিজের শরীরকে বদলে ফেলার 'অধিকার' তাকে দিতে হবে। এই 'মনে হওয়া'র চিকিৎসা করা যাবে না, বরং বদলে দিতে হবে শরীরকে। সেইজের ক্ষেত্রে ঠিক এ ব্যাপারটাই ঘটেছে।

'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটার প্রথম ব্যবহার ১৯৬৫ সালে। কেতাবিভাবে ট্রান্সজেন্ডার বলতে এমন কোনো মানুষকে বোঝানো হয়, যার 'আত্মপরিচয়ের উপলব্ধি তার শরীরের সাথে মেলে না'। কথাটা একটু খটমটে শোনায়, সহজে বলি। ট্রান্সজেন্ডার হলো এমন কেউ, যার দেহ পুরুষের কিন্তু সে নিজেকে নারী বলে দাবি করে, অথবা যার দেহ নারীর কিন্তু সে নিজেকে পুরুষ দাবি করে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রধান দাবি হলো,

জন্মগত দেহ যা-ই হোক না কেন, কেউ নিজেকে নারী দাবি করলে তাকে নারী বলে মেনে নিতে হবে। নিজেকে যে পুরুষ দাবি করবে তাকে মেনে নিতে হবে পুরুষ বলে। আইনি ও সামাজিকভাবে।

মানুষ ইচ্ছেমতো পোশাক পরবে, ইচ্ছেমতো ওষুধ আর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের দেহকে বদলাবে। কেউ যদি অস্ত্রোপচার না করেই নিজেকে বিপরীত। লিঙ্গের বলে দাবি করে, তাও মেনে নিতে হবে মুখ বুজে। রাষ্ট্র ও সমাজ বাধা দিতে পারবে না, বরং 'সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে এ ধরনের মানুষকে দিতে হবে বিশেষ সুবিধা।

সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদম ছোটবেলা থেকে সবাইকে শেখাতে হবে, মানুষের মনটাই গুরুত্বপূর্ণ; দেহ না।

প্রবল আগ্রহে এই মতবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো। মধ্যপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী, সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই মতবাদ প্রচার করে চলছে উগ্রভাবে। এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে আইন এবং এই মতবাদ আজ শেখানো হচ্ছে পশ্চিমের স্কুলগুলোতে। এই মতবাদের খপ্পরে পড়েই নিজেকে 'ড্র্যাইকো' ভাবতে শুরু করেছিল সেইজ।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের বক্তব্য এতটাই বিদঘুটে যে, প্রথম শোনার পর অনেকে বিশ্বাসই করতে পারেন না যে, আদৌ এমন কোনো মতবাদ থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন-

- হয়তো কোনো কারণে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
- হয়তো এটা তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন।
- হয়তো এটা মানবিক বিবেচনা আর অধিকারের বিষয়।
- হয়তো যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়, নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেয়, তাদের শারীরিক কোনো সমস্যা আছে।

২.৩ আরো কিছু বাস্তব উদাহরণ

রিচার্ড লাভিন:

জন্ম ১৯৫৭ সালে, ধনী ইহুদি পরিবারে। পড়াশোনা করেছে ম্যাসাচুসেটসের এক অভিজাত বয়েজ স্কুলে। তারপর উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছে হার্ভার্ড আর টুলেইন ইউনিভার্সিটিতে থেকে। ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা রিচার্ড এখন অ্যামেরিকার পেন স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু রোগ ও মানসিক রোগের প্রফেসর। রিচার্ডের আছে দুই সন্তান।

কিন্তু ২০১১ সালে দুই বাচ্চার বাপ, ৫৪ বছর বয়সী রিচার্ড ঘোষণা করে, সে আসলে একজন নারী। নতুন নাম নেয় ‘ব্যাইচেল'। ২০২১ সালে রিচার্ড; না সরি, 'ব্যাইচেল', অ্যামেরিকার অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি অফ হেলথ মনোনীত হয়। সরকারি সব ঘোষণায় বলা হয়-লাভিন হলো অ্যামেরিকার জনস্বাস্থ্য বাহিনীতে কাজ করা প্রথম ফোর-স্টার 'নারী অফিসার'।

জেইমস প্রিটযকার:

অ্যামেরিকার সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর একটা হলো প্রিটযকার পরিবার। বিখ্যাত হায়াত হোটেলের মালিক এই প্রিটযকাররা। আছে মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি আর অস্ত্র বানানোসহ আরও নানা ব্যবসা। মোট কত টাকা ওদের, নিজেরাও ঠিকঠাক জানে কি না সন্দেহ। এই বিলিয়নেয়ার ইহুদি পরিবারের সন্তান জেইমস প্রিটযকার মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে

লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেয় ২০০১ সালে। দুইবার বিয়ে করা প্রিটযকার এক মেয়ে আর দুই ছেলের বাবা।

২০১৩ সালে, ৬৩ বছর বয়সে ভদ্রলোক নিজেকে নারী ঘোষণা করে এবং আইনিভাবে নিজের নাম বদলে নেয়। তার নতুন নাম 'জেনিফার'। 'জেনিফার' প্রিটযকারকে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার বিলিয়নেয়ার বলা হয়। যদিও পরিচয় বদলানোর আগেই পারিবারিক সম্পত্তির সুবাদে বিলিয়েনেয়ার ছিল সে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের অর্থায়নের পেছনে সবচে' বেশি টাকা ঢালা প্রতিষ্ঠানের লিস্ট করা হলে প্রথম তিনের মধ্যে থাকবে প্রিটযকারের গড়ে তোলা টাওয়ানি ফাউন্ডেশনের নাম।

মহিলা কারাগারে গর্ভবতী দুই কয়েদি:

বিচিত্র এ ঘটনা ঘটেছে অ্যামেরিকাতে। ২০১১ সালে হত্যার দায়ে ত্রিশ বছরের জেল হয় ডেমিট্রিয়াস মাইনর নামে এক যুবকের। নয় বছর জেলে খাটার পর হঠাৎ করে নিজেকে সে নারী দাবি করতে শুরু করে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের বিষে আচ্ছন্ন অ্যামেরিকান বিচারব্যবস্থা দাবি মেনে নিয়ে তাকে পাঠায় মহিলা কারাগারে। কারাগারে নারীদের সাথেই রাখা হয় আপাদমস্তক পুরুষ ডেমিট্রিয়াসকে। ফলে যা হবার তাই হয়, ডেমিট্রিয়াসের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জের ধরে গর্ভবতী হয়ে পড়ে দুই নারী কয়েদি। এ ঘটনার পর ডেমিট্রিয়াসকে আবারও পুরুষদের কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মহিলা ওয়ার্ডে ধর্ষিত রোগী:

হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের ভেতর নিজেকে নারী দাবি করা পুরুষের হাতে ধর্ষিত হয়েছেন একজন নারী রোগী। ধর্ষিত নারী যখন বিচার চাইতে গেছেন তখন তাকে বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি যেহেতু নিজেকে নারী বলে দাবি করেছে, তাই সে নারী। আইনের দৃষ্টিতে ধর্ষণ সংঘটিত হয় পুরুষের মাধ্যমে। একজন নারী কখনো ধর্ষক হতে পারে না। কাজেই এখানে কোনো ধর্ষণ হয়নি। পুরো একটা বছর এই নারী বিচার পাননি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য এবং হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর পর পুলিশ এই মামলা নিতে রাজি হয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে যুক্তরাজ্যে।

উল্লেখিত ওপরের উদাহরণগুলো থেকে বুঝা যাচ্ছে, ট্রান্সজেন্ডারবাদের সাথে শারীরিক ত্রুটি বা এ জাতীয় কিছুর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ সুস্থ নারী বা পুরুষ, যারা একসময় স্বাভাবিকভাবে বাবা কিংবা মা হয়েছে-এক পর্যায়ে নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের বলে ঘোষণা দিচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরতে শুরু করছে, নাম বদলাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সার্জারির মাধ্যমে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করছে। দাবি করছে-সমাজ তাদের এভাবেই মেনে নিক। অনেকে আবার কোনো অপারেশন ছাড়াই দিব্যি বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হিসেবে জীবন কাটাচ্ছে।

২.৪ 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি

আমাদের মধ্যে একটা ধারণা আছে, 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির মাধ্যমে নারী থেকে পুরুষ বা পুরুষ থেকে নারী হওয়া যায়। এটি ভুল ধারণা। তথাকথিত লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির মাধ্যমে কেউ আসলে পুরুষ থেকে নারী কিংবা নারী থেকে পুরুষ হয় না। এগুলো এক ধরনের কসমেটিক সার্জারি। এখানে বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন হয় কেবল। পুরো প্রজননব্যবস্থা বদলায় না। যার জন্ম নারী হিসেবে, শত অস্ত্রোপচার করা হলেও তার শরীর বীর্য উৎপাদন করতে পারবে না। তার ঔরসে সন্তানের জন্ম হবে না। যার জন্ম হয়েছে পুরুষ হিসেবে, শত অস্ত্রোপচার করা হলেও সে সন্তান জন্ম দিতে পারবে না।

তাহলে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' বলে আসলে কী বোঝানো হয়? আসলে কী করা হয় এ ধরনের সার্জারিতে?

একদম সোজাসাপ্টাভাবে বললে, একজন পুরুষের ক্ষেত্রে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির মানে হলো অপারেশন করে তার বুকে কৃত্রিম 'স্তন' বসানো, তার অণ্ডকোষ ফেলে দেওয়া আর পুরুষাঙ্গ কেটে উল্টে (invert) দিয়ে দু' পায়ের মাঝখানে একটা ছিদ্র তৈরি করা। নারীদের ক্ষেত্রে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' এর অর্থ হলো, তার স্তন কেটে বাদ দেওয়া, শরীর থেকে জরায়ু এবং গর্ভধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য অংশ কেটে ফেলে দেওয়া, তারপর হাতের কবজি কিংবা পা থেকে কিছু পেশী নিয়ে কৃত্রিমভাবে একটি 'পুরুষাঙ্গ' তৈরি করা।

এই কৃত্রিম যোনী এবং কৃত্রিম পুরুষাঙ্গ কোনোটাই সত্যিকারের অঙ্গের মতো কাজ করে না। প্রজননের ক্ষেত্রে তো না-ই, যৌনতার ক্ষেত্রেও না। কথাটা সহজে, একটু স্থূলভাবে

বলি-পাঠাকে খাসি করলে সেটা মাদী ছাগী হয়ে যায় না। সে তখন বাচ্চা দিতে পারে না, দুধ দিতে পারে না। জায়গামতো 'ছিদ্র' করে দিলেও পারে না।

তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক আছে, আর তা হলো হরমোন ট্রিটমেন্ট। পুরুষত্বের জন্য দায়ী প্রধান হরমোন টেস্টোস্টেরন। এই হরমোনের প্রভাবেই বয়ঃসন্ধির সময় পুরুষের কণ্ঠ ভারী হয়, দাড়ি গজায়, শরীরে লোম গজায়, মাংসপেশী ও হাড়ের ঘনত্ব বাড়ে। এ হরমোন পুরুষদেহে তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবে। পুরুষদের রাগ, আগ্রাসী মনোভাব এবং ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতার পেছনেও জোরালো ভূমিকা রাখে এই হরমোন। তাই দেখবেন, অনেক ক্রীড়াবিদ এবং বডিবিল্ডার পারফরমেন্স বাড়াতে এবং শরীরকে আরও পেশীবহুল করতে টেস্টোস্টেরন ব্যবহার করেন।

অন্যদিকে নারীত্বের জন্য দায়ী প্রধান হরমোন ইস্ট্রোজেন। বয়ঃসন্ধির সময়ে নারীদেহে আসা পরিবর্তনগুলোর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই হরমোন। ইস্ট্রোজেনের কারণে নারীদেহে চর্বির পরিমাণ বেশি হয়, শরীরের কাঠামো হয় কমনীয় এবং নারীসুলভ।

তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন'-এর সময় পুরুষদের ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন। *(প্রোজেস্টেরন এক ধরনের সেক্স হরমোন, যা মাসিক, গর্ভধারণ ও ভ্রূণীয় বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে)* এবং নারীদের টেস্টোস্টেরন হরমোন দেওয়া হয় উচ্চ পরিমাণে। অর্থাৎ তাদের দেহে বিপরীত লিঙ্গের হরমোন ঢোকানো হয়। টেস্টোস্টেরনের প্রভাবে নারীদের কণ্ঠ ভারী হয়ে আসে, চুল পড়তে শুরু করে, দাড়ি গজায় এবং শরীরের কমনীয়তা কমে। পেশী কিছুটা বাড়ে। অন্যদিকে ইস্ট্রোজেনের প্রভাবে পুরুষের কণ্ঠ চিকন হয়, শরীরে চর্বি বাড়ে (বিশেষ করে বুকে ও কোমরে) এবং সার্বিকভাবে তার অবয়ব পুরুষের তুলনায় গোলগাল হতে শুরু করে। [৫]

তবে যত হরমোনই দেওয়া হোক না কেন, এতে করে একজন পুরুষ নারী হয়ে যায় না। একজন নারী পুরুষে পরিণত হয় না। স্রেফ বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন আসে। তাছাড়া কৃত্রিমভাবে তৈরি করা অঙ্গ যৌনতা বা প্রজনন, কোনো ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক অঙ্গের মতো কাজ করতে পারে না। 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করা প্রতিটি মানুষ প্রজননে অক্ষম। এক অর্থে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সবচেয়ে চরম ধরনের বন্ধ্যাকরণ।

কৃত্রিমভাবে তৈরি পুরুষাঙ্গ 'নান্দনিকতার' বাইরে অন্য কোনো কাজে আসে না। আর কৃত্রিমভাবে তৈরি করা 'যোনী'র ব্যাপারটা একজন ভুক্তভোগীর নিচের মন্তব্য থেকেই বুঝে নেওয়া যায়, কোনো অপারেশন করেই নারীর যোনীর কাছাকাছি কিছু বানানো সম্ভব না। এই অপারেশন একটা ডাকাতি। এটা (অপারেশন করে যা বানানো হয় সেটা) একটা খোলা ক্ষত ছাড়া আর কিচ্ছু না। এটাকে যারা কৃত্রিম যোনী বলে, তারা ডাকাত। এরা শুধু অজ্ঞ, সাধাসিধে, বোকা মানুষদের টাকা হাতিয়ে নিতে চায়। [৬] খুব অল্পসংখ্যক রোগীই সার্জারির পর নতুন 'যৌনাঙ্গ' নিয়ে সন্তুষ্ট হয়। অনেকেই 'সংশোধনমূলক' আরও বিভিন্ন সার্জারি করায়। [৭]

সার্জারির পর থাকে নানা ধরনের জটিলতা, অনেক ক্ষেত্রে তীব্র শারীরিক কষ্ট। হরমোন ট্রিটমেন্টের কারণে অনেকে আক্রান্ত হয় ক্যান্সারে। [৮]

পশ্চিমা বিশ্বে নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করা লোকদের বড় একটা অংশই হরমোন ট্রিটমেন্ট এবং সার্জারি করে না। ট্রান্সজেন্ডার দাবিদারদের মধ্যে হরমোন ট্রিটমেন্ট নেয় অর্ধেকের মতো। আর 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করে টেনেটুনে মাত্র ২৫%। [৯]

অন্যদিকে অপারেশন করে 'রূপান্তরিত' হওয়া মানুষদের মধ্যে অনেকে ভুল বুঝতে পেরে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চায়। কিন্তু সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে তারা নিজেরাই। তাই তাদের মধ্যে তৈরি হয় হতাশা, আত্মহত্যার প্রবণতা। [১০] সার্জারি করার পর আবার আগের অবস্থায় ফিরতে চাওয়া বা 'রূপান্তরের প্রক্রিয়া' বন্ধ করে দেওয়াকে বলা হয় ডিট্র্যানযিশান।

মোদ্দাকথা হলো, ডাক্তাররা কসমেটিক সার্জারি করে সেটাকে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' বলছেন। অথচ তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে জানেন, এসব অপারেশনের ফলে একজন পুরুষ নারীতে বা নারী পুরুষে পরিণত হয় না। একই কারণে ট্রান্সসেক্সুয়াল শব্দটাও বিভ্রান্তিকর। কারও সেক্স আসলে রূপান্তর করা যায় না। নিজের দেহের পরিচয়কে মুছে ফেলা যায় না। দেহকে অতিক্রম করা যায় না। লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির জগতে জর্জেস ব্যুরো নামটা কিংবদন্তির মতো। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে মরক্কোর ক্যাসাব্ল্যাংকাতে ঘাটি গেড়ে বসা এই ফরাসি সার্জন ১৯৭৩ নাগাদ করে ফেলেছিল তিন হাজারের বেশি লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি। [১১] নিজের কাজের ব্যাপারে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল ড. ব্যুরোর। সব ভণিতা আর বায়বীয় তত্ত্বের

কচকচি বাদ দিয়ে ব্যুরো সরাসরি বলেছিল, আমি পুরুষকে নারী বানাই না। আমি পুরুষাঙ্গকে এমনভাবে রূপান্তর করি, যাতে সেটাতে নারীসুলভ কিছু বৈশিষ্ট্য আসে। ব্যস, এটুকুই। বাদবাকি সব রোগীর মনের ব্যাপার। [১২]

কথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের বাস্তবতার পুরোটা বোঝার জন্য এই চারটা বাক্যই যথেষ্ট।

২.৫ বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডার

বাংলাদেশেও সাম্প্রতিক সময়ে সার্জারি করে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে সেই একই বৈশিষ্ট্য। বারডেম হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ফিরোজ আমিন লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষদের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন,

আমার এক রোগী যেমন আছে, সে না বুঝে মেয়ে হয়ে গেছে। এটা একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি আমি তাকে বললাম, তুমি এটা কেন হয়েছো? সে বললো, আমার আসলে নরমাল (স্বাভাবিক) সেক্স ভালো লাগত না। সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসির কারণে সে মেয়ে হয়েছে। সে ছেলে, কিন্তু সে আরেকটা ছেলের সাথে মেয়ে হিসেবে (মেয়ের ভূমিকায়) মেলামেশা করছে। [১৩]

শারমিন আক্তার ঝিনুক নামে এক নারীর 'সেক্স চেইঞ্জ' অপারেশনের কথা দেশি মিডিয়াতে আলোচিত হয়েছে। এই নারী শারীরিকভাবে সুস্থ, কিন্তু অন্য 'নারীর প্রতি আকৃষ্ট' হবার কারণে 'নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত' হয়েছে। নাম নিয়েছে জিবরান সওদাগর। দেশি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে তার বক্তব্য দেখা যাক,

জিবরান বলেন, 'আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি, একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেই মেয়ে চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেত না। জিবরান বলেন, ২০২১ সালে তিনি ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলা, পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন। [১৪]

এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, শারমিন আক্তার নামের এ নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিল। আরেকজন নারীর প্রতি তার বিকৃত কামনা ছিল, যে কামনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য সে নিজেকে 'পুরুষে রূপান্তরিত' করেছেন। লিঙ্গ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বিকৃত যৌনতা ও ফ্যান্টাসি। কিন্তু বিষয়টি সাফসুতরো করে উপস্থাপন করার জন্যে এই সম্পর্ককে ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দেওয়া হয়।

লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষরা বাস্তবতার ব্যাকরণকে উপেক্ষা করে তারা পড়ে থাকে কাল্পনিক ভালো লাগার পেছনে। নিজেদের বিকৃত যৌনতা আর অসুস্থ ফ্যান্টাসিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য অর্থহীন কিছু গালগল্প তৈরি করে।

আবেগ, মুখস্থ করা মিথ্যা আর কুড়িয়ে কুড়িয়ে শেখা নানা তত্ত্বের একটা খিচুড়ি বানায়। বারবার সেটা নিজেকে শোনায়। একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করে। তারপর দাবি নিয়ে হাজির হয় সমাজের কাছে। দুনিয়ার কাছে নিজেদের বিকারগ্রস্ত কল্পজগতের স্বীকৃতি চেয়ে বসে। কিন্তু এত কাঠখড় পোড়ানোর পরও ধূলোর ওপর বানানো বালির প্রাসাদ অর্থহীনই থেকে যায়। ফড়িঙের ঢং ধরা জিরাফ উড়তে পারে না কখনো।

জন মানির 'জেন্ডার রোল' বা 'লিঙ্গ ভূমিকার' তত্ত্ব

ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থান এবং বিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা মানুষগুলোর অন্যতম হলো ড. জন মানি। তিনি ছিল এরিকসন ফাউন্ডেশনের বোর্ড মেম্বারও। ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে নানা দেশে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের তত্ত্ব প্রচার করে বেড়াতো সে। তার উদ্যোগেই চালু হয়েছিল জনস হপকিন্সের লিঙ্গ পরিবর্তন ক্লিনিক। চিকিৎসাক্ষেত্রে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের স্বাভাবিকীকরণে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের তালিকা করা হলে হ্যারি বেঞ্জামিনের ঠিক পরেই আসবে তার নাম।

তবে জন মানির সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী এবং বিধ্বংসী অবদান হলো তার 'জেন্ডার রোল' বা 'লিঙ্গ ভূমিকার' তত্ত্ব। এ তত্ত্ব থেকে জন্ম নেয় জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদ, যার প্রভাবে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ একসময় পরিণত হয় ট্রান্সজেন্ডারবাদে। বিকৃতির তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে মানির ভূমিকার তুলনা চলে কেবল অ্যালফ্রেড কিনসির সাথে।

ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ কী করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ হয়ে উঠলো, তা বুঝতে হলে ব্যক্তি জন মানির পাশাপাশি আমাদের পরিচিত হতে হবে তার চিন্তা ও কাজের সাথে।

৩.১ জেন্ডার

হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করার পর জন মানি চাকরিজীবন শুরু করে জনস হপকিন্সে। শিক্ষক হিসেবে। তার পিএইচডি ছিল আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে, এবং এ নিয়েই জনস হপকিন্সে কাজ করছিল সে। গবেষণার অংশ হিসেবে ১৯৫৫ সালে 'জেন্ডার রোল' বা 'লিঙ্গ ভূমিকা' নামে একটি ধারণা প্রস্তাব করে মানি। সেই তত্ত্ব নিয়ে কথা বলার আগে জেন্ডার শব্দের ইতিহাসটা এক নজর দেখে নেওয়া দরকার।

ইংরেজি ভাষায় জেন্ডার (gender) শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে, ব্যাকরণের আলোচনায়। [১৫] ঐ যে ছোটবেলাতে আমরা বাংলা ব্যাকরণে 'লিঙ্গ' পড়েছি না? পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ-এসব? বাংলা ব্যাকরণের এই 'লিঙ্গ' এসেছে ইংরেজি ব্যাকরণের 'জেন্ডার' থেকে। প্রথমদিকে জেন্ডার শব্দের ব্যবহার শুধু ব্যাকরণের মধ্যে সীমিত ছিল, শব্দের পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ অর্থে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো বায়োলজিকাল সেক্স-এর সমার্থক শব্দ হিসেবে, অর্থাৎ একজন মানুষ নারী নাকি পুরুষ তার শ্রেণিবিভাগে জেন্ডার শব্দটা ব্যবহার হয়। তবে বিংশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত এমন ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত। নারী বা পুরুষ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বোঝাতে 'সেক্স' শব্দটাই বেশি ব্যবহার হতো। জেন্ডার ব্যবহৃত হতো ব্যাকরণগত অর্থে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে জেন্ডার শব্দটার ব্যবহার পাওয়া যায় ১৯৪৫ সালে। ম্যাডিসন বেন্টলি নামে একজন মনোবিদ এই শব্দ ব্যবহার করে নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্যের সামাজিক দিককে বোঝাতে। [১৬] তবে শব্দটাকে সত্যিকার অর্থে পরিচিত করে তোলে জন মানি। ১৯৫৫ সালে এক অ্যাকাডেমিক পেপারে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে আলোচনাতে প্রথমবারের মতো 'জেন্ডার রোল' (Gender role) পরিভাষা প্রস্তাব করে সে। জেন্ডার শব্দটাকে সে প্রয়োগ করে নতুন এক পারিভাষিক অর্থে।

জন্মগতভাবে আন্তঃলিঙ্গ শিশুদের যৌনাঙ্গের বিকাশজনিত নানা ত্রুটি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে থাকে অপূর্ণাঙ্গতা। মানির মতে, এ ধরনের শিশুদের প্রধান চিকিৎসা অপারেশন। এতটুকু পর্যন্ত মোটামুটি ঠিকই ছিল, কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধলো যখন নিজের প্রস্তাবনার পক্ষে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলো সে। মানি বললো, জন্মের পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিশুরা কাঁদামাটির মতো থাকে। এসময় যেকোনোভাবে তাদের গড়ে নেওয়া যায়। শরীর যাই হোক না কেন, সময়মতো অপারেশন করা হলে যেকোনো শিশুকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে বড় করা সম্ভব।

ধরুন, কোনো ছেলেশিশুর জন্ম হয়েছে অপূর্ণাঙ্গ পুরুষাঙ্গ নিয়ে। তার দেহের ভেতরের প্রজনন ব্যবস্থা পুরুষের। মানির তত্ত্ব অনুযায়ী, জন্মের আঠারো মাসের মধ্যে যদি অপারেশন করে পুরুষাঙ্গ ফেলে দেওয়া হয়, তারপর বাবা-মা যদি তাকে মেয়ে হিসেবে বড় করে, তাহলে এই শিশু একজন সুস্থ স্বাভাবিক নারী হিসেবে বেড়ে উঠবে। হ্যাঁ, সে গর্ভধারণ করতে পারবে না। বয়ঃসন্ধির সময় তাকে হরমোন নিতে হবে, কিছু সার্জারি করাতে হবে প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর। তবে এমন অল্প কিছু দৈহিক ব্যাপার ছাড়া বাকি সব দিক থেকে সে হবে একজন নারী। নিজেকে সে নারী হিসেবে চিনবে, জানবে, দেখবে। অন্যান্য নারীর সাথে তার চিন্তা, আচরণ, আবেগে তেমন কোনো পার্থক্য হবে না। নারীর মতোই সে কামনা করবে।

এখানেই জেন্ডার রোলের ধারণা নিয়ে আসলো মানি। বললো, শরীর আর জেন্ডার রোল, দুটো আলাদা জিনিস। শরীর হলো জন্মগত। আর জেন্ডার রোল হলো, 'নারী বা পুরুষ হবার সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য'। [১৭] মানি আরও বললো, শিশু নিজেকে কোন পরিচয়ে চিহ্নিত করবে তা প্রায় পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিকতার ওপর; দেহের ওপর না। যেহেতু জন্মের আঠারো মাসের মধ্যেই পারিবারিকভাবে তাকে নারী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলা হচ্ছে এবং তার শরীর থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে পুরুষত্বের চিহ্ন, তাই এই শিশু মানসিকভাবে একজন নারী হবে।

মানি তার জেন্ডার রোলের তত্ত্ব তৈরি করেছিল আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে গবেষণার আলোকে। তার নিজের ভাষ্যমতেই, 'জেন্ডারের এই নতুন অর্থের পেছনে অবদান রাখা অধিকাংশই ছিল হারমাফ্রোডাইট বা আন্তঃলিঙ্গ' [১৮] কিন্তু পুরো মানবজাতির ওপর সে

এই তত্ত্ব চাপিয়ে দিলো। ঢালাওভাবে উপসংহার টেনে দিলো, মানুষের দেহ জন্মগত, কিন্তু তার জেন্ডার রোল সামাজিকভাবে নির্মিত। মানুষ নারী বা পুরুষ হয়ে উঠতে শিখে। আর এই শেখাটা নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর। মানির এই তত্ত্ব দেহ আর পরিচয়কে পৃথক করে ফেললো। তার প্রচার করা জেন্ডার রোল-এর ধারণা লুফে নিয়ে জেন্ডার আইডেন্টিটি বা লিঙ্গ পরিচয় নামে আরেকটি ধারণা প্রস্তাব করলো ক্যালিফোর্নিয়া মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ ড. রবার্ট স্টৌলার। স্টৌলার বললো, জেন্ডার আইডেন্টিটি হলো নিজের পরিচয়ের ব্যাপারে একজন মানুষের অনুভূতি। এই অনুভূতি তার দেহের সাথে নাও মিলতে পারে। মানির মতো স্টোলারেরও প্রাথমিক গবেষণা ছিল আন্তঃলিঙ্গের মানুষদের নিয়ে। [১৯] আবারও মনে করিয়ে দিই, পুরো মানবজাতির ০.০১৮% হলো ইন্টারসেক্স। এই চরম সংখ্যালঘু মানুষদের নিয়ে বানানো অপ্রমাণিত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকে চাপিয়ে দেওয়া হলো পুরো মানবজাতির ওপর।

৩.২ তত্ত্বের প্রমাণ

মানি আর স্টোলার তত্ত্ব দিলো। হ্যারি বেঞ্জামিন আর এরিকসন ফাউন্ডেশনের মতো কিছু প্রতিষ্ঠান এসব তত্ত্ব গ্রহণও করে নিল। কিন্তু বৃহত্তর মেডিক্যাল ফিল্ডে গ্রহণযোগ্যতা পাবার জন্য তত্ত্বের পাশাপাশি প্রয়োজন ছিল প্রমাণের। প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী মানি যখন নিজের তত্ত্বের জন্য উদগ্রীব হয়ে প্রমাণ খুঁজছে, ঠিক সেই সময় ১৯৬৭ সালের এক সকালে তার বাল্টিমোরের অফিসে এসে হাজির হলো রনাল্ড এবং জ্যানেট রাইমার।

রাইমার দম্পতি কানাডার উইনিপেগের বাসিন্দা। যমজ দুই ছেলে তাদের, ব্রুস আর ব্রায়ান। এক মেডিক্যাল দুর্ঘটনায় আট মাস বয়সে ব্রুসের লিঙ্গ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এরপর ছেলের স্বাভাবিক জীবনের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল রাইমাররা। তবে টিভিতে জন মানির সাক্ষাৎকার দেখার পর তাদের মনে হয়, হয়তো ব্রুসকে তিনি সাহায্য করতে পারবেন।

জন মানি যেন আকাশের চাঁদ পেল হাতে। রাইমার যমজরা মানির চোখে ধরা দিলো তার তত্ত্বকে প্রমাণ করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে। তার তত্ত্ব যদি সঠিক হয়, মানুষের পরিচয় যদি আসলেই দেহের বদলে পরিবেশ ও সমাজের ওপর নির্ভর করে, তাহলে ব্রুসকে মেয়ে

হিসেবে বড় করা সম্ভব। দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন বেড়ে উঠবে সুস্থ পুরুষ হিসেবে, আরেকজন সুস্থ নারী হিসেবে।

জন মানি রাইমারদের পরামর্শ দিলো ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করার। বললো, একজন অসম্পূর্ণ পুরুষ হবার বদলে একজন পরিপূর্ণ নারী হতে পারবে ও। তবে যত দ্রুত সম্ভব ব্রুসের শরীর থেকে পুরুষাঙ্গের অবশিষ্ট অংশ এবং অণ্ডকোষ কেটে বাদ দিতে হবে। কৈশোরের শুরুতে দিতে হবে হরমোন ট্রিটমেন্ট। আর ট্রিটমেন্টের চূড়ান্ত পর্যায়ে সার্জারির মাধ্যমে কৃত্রিম যোনী স্থাপন করা হবে ওর শরীরে। আর হ্যাঁ, একটা নতুন নাম দিতে হবে ওর।

বিশ্ববিখ্যাত মনোবিদ ড. জন মানির কথা মেনে নিলো উইনিপেগের মধ্যবিত্ত দম্পতি। ব্রুসের অপারেশন হলো। ওর নতুন নাম দেওয়া হলো ব্রেন্ডা। বাবা-মা ওকে মেয়ে হিসেবেই বড় করতে লাগলো।

গভীর আত্মতৃপ্তি নিয়ে একের পর এক প্রবন্ধ, বক্তব্য আর বইতে ব্রুস রাইমারের কেইসকে অমিশ্র সাফল্য হিসেবে তুলে ধরলো জন মানি। ব্রুসের ব্রেন্ডাতে 'রূপান্তর' হওয়াকে উপস্থাপন করলো তার তত্ত্বের অকাট্য প্রমাণ হিসেবে। দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন ছেলে আর অন্যজন সুস্থ সবল মেয়ে হিসেবে বড় হচ্ছে, এটাই প্রমাণ করে পরিবেশই মানুষকে 'নারী' বা 'পুরুষ' বানায়। প্রকৃতি না। কে কোন ধরনের শরীরে নিয়ে জন্মাচ্ছে তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো মানসিকভাবে সে কোন লৈঙ্গিক ভূমিকা বা জেন্ডার রোল গ্রহণ করছে।

ব্রুস রাইমারের কেইসের কথা যুক্ত করা হলো সাইকোলজি, সেক্সোলজি, জেন্ডার স্টাডিসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের পাঠ্যবইয়ে। প্রমাণিত সত্য হিসেবে গৃহীত হয়ে গেল মানির তত্ত্ব। মানির তত্ত্ব আর সাফল্যের গল্পকে অনেকে নারীবাদের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করলো। ১৯৭৩ টাইম ম্যাগাজিনের জানুয়ারি সংখ্যায় লেখা হলো, 'চাঞ্চল্যকর এই কেইস নারীবাদীদের বক্তব্যের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেয়। [২০]

মনস্তত্ত্ব ও যৌনতার গবেষণায় নব দিগন্তের সূচনাকারী হিসেবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থান করে নিলো ড. জন মানি। জেন্ডারের ধারণা ঢুকে পড়লো সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত নানা শাস্ত্রে।

৩.৩ মানির তত্ত্ব ভুল

মানির তত্ত্ব ভুল ছিল। একবারে শুরু থেকেই রাইমাররা বুঝতে পারছিল, হিসেবে মিলছে না। কোথাও বড় একটা ভুল হয়ে গেছে। ছোটবেলা থেকেই হাটা, চলা, কথা সবকিছুতে ব্রুসকে দেখা যেত, 'ব্রেন্ডা'কে না। স্কুলে ও ছিল একা, রাগী, একগুঁয়ে। মেয়েদের সাথে খেলতে চাইতো না, ছেলেরা ওকে খেলায় নিতো না। একের পর এক মনোবিদ বললো, শৈশবের কোনো স্মৃতি না থাকা সত্ত্বেও কোনো এক কারণে নিজের এই রূপান্তরকে ব্রুস মেনে নিচ্ছে না। মানিকে জানানো হলে ব্যাপারটাকে 'টমবয়ের স্বাভাবিক দস্যিপনা' বলে স্রেফ উড়িয়ে দিলো সে। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাড়লো সমস্যাগুলো। ব্রুস বুঝতে পারছিল ও অপরিচিত, অদ্ভুত। এক পর্যায়ে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিলো ওর মধ্যে। শেষ পর্যন্ত জন মানির অমতেই ওকে ওর অতীত সম্পর্কে জানাবার সিদ্ধান্ত নিলো বাবা-মা।

১৯৮০-এর মার্চের এক পড়ন্ত দুপুরে সাইকলোজিস্টের সাথে সাপ্তাহিক সেশনের পর ব্রুসকে সব কিছু খুলে বললো ওর বাবা। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া পানি আর হাতের গলতে থাকা আইসক্রিমের ফোটা এক এক করে জমতে থাকলো ওর কোলে। কিছুক্ষণ পর শান্ত গলায় নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো ব্রুস। ও ছেলে, আর ছেলে হিসেবেই বাকি জীবন কাটাবে। অতীতের সব চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টায় নিজের জন্য নতুন এক নাম বেছে নিলো ও। ডেইভিড, বাইবেলের সেই ছেলেটার মতো, বিশাল এক দানবকে যে যুদ্ধে হারিয়েছিল।

তারপর...

তারপর ডেইভিড সুখে-শান্তিতে বাকি জীবন কাঁটিয়ে দিল। ক্ষতবিক্ষত, ভ্রমণ ক্লান্ত, কিন্তু সন্তুষ্ট একজন মানুষ হিসেবে গল্পটা এখানে, এভাবে শেষ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু শরীরের ক্ষত শুকিয়ে গেলেও মনের ক্ষত সহজে শুকায় না। বাল্টিমোরে জন মানির সাথে নির্জন সেশনগুলোতে এমন কিছু হয়েছিল যার তাজা বাতি বয়ে বেড়াচ্ছিল ডেইভিড

আর ব্রায়ান। এমন এক অন্ধকারে উঁকি দিতে বাধ্য হয়েছিল, শত চেষ্টার পরও যার দাগ মুছতে পারেনি ওরা।

৩.৪ মানসিক ক্ষতচিহ্ন ও নিষ্ঠুরতা

নিয়মিত চেকআপের অংশ হিসেবে বছরে একবার কানাডা থেকে অ্যামেরিকার বাল্টিমোরে যেত রাইমাররা। প্রথমে চারজন বসতো জন মানির অফিসে। রন আর জ্যানেটের সাথে অল্প কিছুক্ষণ কথা বলার পর প্রাইভেট সেশনের জন্য ব্রুস আর ব্রায়ানকে আলাদা রুমে নিয়ে যেত মানি। নির্জন অফিস রুমে ওদের বিভিন্ন ছবি দেখাতো সে। নারী ও পুরুষের নগ্ন ছবি, যৌনাঙ্গের ছবি, সন্তান প্রসবের ছবি। কখনো কখনো পর্নোগ্রাফি। তারপর ব্রুস আর ব্রায়ানকে কাপড় খুলে নগ্ন হবার নির্দেশ দিতো। ৭ বছরের নগ্ন ক্রসকে বাধ্য করতো মেঝেতে চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে ভর দিতে। তারপর ব্রায়ানকে বলতো ব্রুসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে... কখনো কখনো ব্রুসকে নগ্ন হয়ে দু পা দু দিকে ছড়িয়ে চিত হয়ে শোয়াতো মানি। ব্রায়ানকে বাধ্য করতো ব্রুসের ওপরে উঠতে। তারপর ওদের ছবি তুলতো। ছোট্ট শিশু দুটিকে সেক্সুয়াল রোল-প্লে তে বাধ্য করতো মানি। [২১]

জন মানির নির্জন অফিস রুমের 'থেরাপি' সেশনগুলো ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে দুই যমজের ওপর। কিশোর বয়সে এসে ব্রুস আর ব্রায়ান যখন বুঝতে পারলো মানি ওদেরকে দিয়ে যা করিয়েছিল তা অজাচার এবং সমকামের অনুকরণ, তখন ঠিক কী অনুভূতি হয়েছিল ওদের? কতটা দুঃসহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজের যমজ ভাইয়ের চোখের দিকে তাকানো? বিভীষিকাময় এই অভিজ্ঞতার স্মৃতির কেমন প্রভাব ফেলেছিল ওদের মনের ওপর?

প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করাটাও বেশ কঠিন। এ ধরনের স্মৃতি একজন মানুষের মনকে স্থায়ীভাবে ভেঙ্গে চুরমার দেয়। দুটো নিষ্পাপ শিশুকে কলুষিত করেছিল জন মানি। ওদের ভেতরে এঁকে দিয়েছিল চিরস্থায়ী ক্ষত।

অন্ধকার এ স্মৃতির অত্যাচার থেকে বাঁচতে অল্প বয়সেই নেশার জগতে ঢুকে পড়ে ব্রায়ান। দুনিয়ার ওপর রাগ নিয়ে বেপরোয়া হয়ে মদ খেতো। বুদ হয়ে থাকতো নানা ড্রাগসে। কিন্তু লাভ হলো না। অবশ হলো না স্মৃতির আঘাত, নাছোড়বান্দার মতো বারবার ওকে টেনে

নিয়ে গেল বাল্টিমোরের সেই রুমে। ২০০২ এর বসন্তে ৩৬ বছর বয়সে আত্মহত্যা করলো ব্রায়ান। ভাইয়ের মৃত্যু প্রচণ্ড প্রভাব পড়লো ডেইভিডের ওপর।

দু' বছর পর, মে মাসের এক ভোরবেলায় নিজের শটগানের ব্যারেলের মাথাটা চেঁছে ফেললো ডেইভিড। তারপর বেড়িয়ে গেল গাড়ি নিয়ে। কিছুক্ষণ পর বাসার কাছের এক সুপারস্টোরের পার্কিং লটে পাওয়া গেল ওর বিস্ফোরিত খুলির মৃতদেহ। রক্ত, মগজ আর করোটির ছিন্নবিচ্ছিন্ন টুকরো ছড়ানো গাড়ির ভেতর পাক খেতে থাকলো এক অভাগার বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা গভীর দীর্ঘশ্বাস। মৃত্যুর সময় ডেইভিড রাইমারের বয়স ছিল ৩৮ বছর। [২২]

ডেইভিড যখন পুরুষ হিসেবে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সেটা জন মানিকে জানানো হয়। তারপর থেকে এই কেইস নিয়ে কথা বলা কমিয়ে দিলেও সাধের 'এক্সপেরিমেন্ট' যে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ কথাটা বেমালুম চেপে যায় সে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে ডেইভিডের কেইসের আসল খবর যখন মিডিয়াতে চলে আসে, তখন মানি তার এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করে মিডিয়া হট্টগোলকে। কখনো রক্ষণশীল মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা বলে, কখনো আবার প্রশ্ন তোলে রন আর জ্যানেটের অভিভাবকত্ব নিয়ে। যদিও এর আগে নিজের মেডিক্যাল নোটসে দু'জনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল সে। ২০০৬ সালে, ৮৫ বছর বয়সে, পার্কিন্সন্সে ভুগে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত ডেইভিড ও ব্রুস রাইমারের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে বিন্দুমাত্র অনুতাপ দেখা যায়নি জন মানির মধ্যে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গভীর আত্মবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্য নিয়ে নিজের তত্ত্ব প্রচার করে যায় ড. মানি।

৩.৫ এই সব ক্লেদাক্ত পথ

একজন বিখ্যাত ও সম্মানিত সাইকলোজিস্ট কেন এমন করলেন? এমন প্রশ্ন উদয় হওয়া স্বাভাবিক। জন মানি প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষী এবং আত্মকেন্দ্রিক ছিল। নিজের তত্ত্বের ওপর তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। যেকোনো মূল্যে এ তত্ত্বকে সঠিক প্রমাণে উদগ্রীব ছিল সে। এ সবই সত্য। তবে এগুলো তার চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকে পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। বেশ কিছু বিষয় অস্পষ্ট থেকে যায়। সেই অস্পষ্টতা গুলোর রহস্য ভেদ করতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ব্যক্তি জন মানির দিকে, আরেকটু গভীরভাবে।

বিকৃতির তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরিতে জন মানির ভূমিকার তুলনা চলে কেবল অ্যালফ্রেড কিনসির সাথে। তবে কিনসির সাথে মানির মিল কেবল এতটুকুতে সীমাবদ্ধ না। চিন্তা, কর্ম এবং জীবন-নানা দিক থেকে কিনসির সাথে অদ্ভুত মিল ছিল মানির।

কিনসির মতো মানিও সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণকে মিশন হিসেবে নিয়েছিল। সত্তরের দশকের শুরু থেকেই নিজের অবস্থান ও প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে সমকামিতাকে মানসিক রোগের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য শুরু করেছিল ওকালতি। একবার বিয়ে করলেও কিনসির মতো মানিরও ঝোঁক ছিল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায়। অবাধ যৌনতা, প্রকাশ্য নগ্নতা, গ্রুপ সেক্স এবং পর্নোগ্রাফির সমর্থনে কট্টরভাবে প্রচারণা চালাতো মানি। নিয়মিত এ ধরনের বিকৃতিতে অংশ নিতো নিজেও।

জন মানি তার ক্লাস এবং পাবলিক লেকচারগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবে চরম মাত্রার অশ্লীলতা তুলে ধরত। 'গবেষণার অংশ হিসেবে' ভরা মজলিসে পর্নোগ্রাফি দেখানোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল তার। একবার অতিথি হয়ে উইনিপেগের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারে উপস্থিত দর্শক, সাংবাদিক, প্রফেসর আর ফার্স্ট ইয়ার মেডিক্যাল ছাত্রদের সামনে বড় পর্দায় পশুকাম, মানব মূত্র পান, মানব বর্জ্য খাওয়া, অ্যাম্পুটেইশান ফেটিশসহ বিভিন্ন যৌন বিকৃতির ছবি নিয়ে তৈরি করা স্লাইড শো দেখিয়েছিল মানি। [২৩]

তার ভাষ্যমতে এই প্রেসেন্টেশনের উদ্দেশ্য ছিল দর্শকদের ডিসেনসেটাইয করা, অর্থাৎ বিকৃতির প্রতি সংবেদনশীলতা নষ্ট করে করে দেওয়া। এ ঘটনার পরের দিন বড় পর্দায়

গ্রুপ সেক্সের ভিডিও দেখায় মানি। ভিডিও শেষে ঘোষণা করে, বিয়ে হলো স্রেফ একটা অর্থনৈতিক বোঝাপড়া, যেখানে হৃদয় কেবল মানিব্যাগের অনুসরণ করে। [২৪]

কিনসির মতো মানিও মনে করত, শিশুরা জন্ম থেকেই যৌনতায় সক্ষম। শিশুকামের বৈধতার পক্ষে রীতিমতো ওকালতি করে সে। ১৯৮৫ সালে তৎকালীন মার্কিন অ্যাটনী জেনারেলের নেতৃত্ব পরিচালিত এক কমিশনের সামনে মানি দাবি করে বসে পর্নোগ্রাফি শিশুদের জন্য ক্ষতিকর না। বরং শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য 'যৌন খেলাধূলা' জরুরি। [২৫] টাইম ম্যাগাজিনের এপ্রিল, ১৯৮০ সংখ্যায় মানি বলে, শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতা, যেমন তুলনামূলকভাবে বয়স্ক কোনো ব্যক্তির সাথে যৌনমিলন শিশুর জন্য যে নেতিবাচকই হবে, এমন কোনো কথা নেই। [২৬]

ডাচ পেডোফিলিয়া ম্যাগাজিন 'পাইডিকা'-তে দেওয়া ১৯৯১ সালের সাক্ষাৎকারে বলা জন মানির নিচের কথাগুলো লক্ষ্য করি -

'ধরুন, আমি যদি দেখি দশ-এগারো বছর বয়সের একটি ছেলে বিশের বা ত্রিশের কোঠায় থাকা কোনো পুরুষের প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে, তাদের সম্পর্ক যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয়, তাদের বন্ধন যদি পারস্পরিক হয়, তাহলে আমার মতে এ ধরনের সম্পর্ককে কোনোভাবেই বিকারগ্রস্ত বা অসুস্থ (pathological) বলা যায় না। [২৭]

পেডোফিলিয়া বা শিশুকামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একই সাক্ষাৎকারে মানি বলে,

'সহজ ভাষায় স্নেহময় শিশুকাম (affectional pedophilia) হলো শিশুদের প্রতি স্নেহময় আকর্ষণ। যেখানে অভিভাবকসুলভ ভালোবাসা ও বন্ধন যৌন ভালোবাসা ও বন্ধনে পরিণত হয়। পুরুষ শিশুকামের ক্ষেত্রে এই স্নেহময় সম্পর্ক হলো পিতৃসুলভ ভালোবাসার মতো। পিতৃসুলভ ভালোবাসার সাথে এখানে যৌন বা প্রেমময় বন্ধন যুক্ত হয়েছে। স্নেহময় ভালোবাসার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রেম ও কামনা। [২৮]

অজাচারের সমর্থনে মানির বক্তব্য আরও জঘন্য। মানি এবং তার এক সহলেখকের মতে, যে সমাজে কেবল একটাই ধর্ম সেখানে অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাস করা যে অর্থে অস্বাভাবিক, অজাচারে লিপ্ত পুরুষের আচরণও ঐ অর্থে অস্বাভাবিক। [২৯] মানির কথার প্রচ্ছন্ন অর্থ

দাঁড়ায়, অজাচারের বিরোধিতা করা আসলে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িকতার মতো একটা ব্যাপার। অজাচারকে তাই অপরাধ গণ্য করা মানির মতে একেবারেই অযৌক্তিক। [৩০]

আগে বিকৃত যৌনাচারের ক্ষেত্রে 'Perversion' বা 'বিকৃতি' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। জন মানি এর বদলে প্যারাফিলিয়া (Paraphilia) শব্দের প্রচলন ঘটায়। স্বাভাবিক যৌনাচারকে মানি সংজ্ঞায়িত করে নর্মোফিলিয়া (Normophilic) নামে। নর্মোফিলিয়া হলো এমন সব যৌনাচার, যা সমাজের বিদ্যমান মানদণ্ড অনুযায়ী-সেটা আইন, ধর্ম বা অন্য কোনো কিছু হতে পারে-স্বাভাবিক (Norm) মনে করা হয়। আর যা কিছু স্বাভাবিক গণ্য হয় না, সেগুলোই প্যারাফিলিয়া। অর্থাৎ যৌনতা কেবল প্রচলিত আর অপ্রচলিত। প্রথাগত আর প্রথাবিরোধী। প্রাকৃতিকভাবে যৌনতার মধ্যে কোনো ভালো-মন্দ নেই। আছে কেবল যৌনতার ব্যাপারে সমাজের ধারণা। পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। যৌনতাকে কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রবণতা কেবলই একটি সামাজিক প্রচলন। ভাষার চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সব ধরনের যৌনাচারকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করে জন মানি। বিকৃত যৌনাচারকে নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত করে কেবল 'অপ্রচলিত' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। তার কণ্ঠ আর কলমে পাওয়া যায় কিনসির প্রতিধ্বনি।

এই ছিল জেন্ডার ধারণার উদ্ভাবক, সম্মানিত মনোবিদ ড. জন মানি। জন মানি; যে ছোট্ট ব্রুস আর ব্রায়ানকে সমকাম ও অজাচারের অনুকরণে বাধ্য করেছিল, যে ছয় বছরের সন্তানের সামনে বাবা-মাকে যৌনমিলন করার পরামর্শ দিয়েছিল, যে শিশুকামের পক্ষে ওকালতি করত, অজাচারের সাফাই গাইতো, শিশুদের পর্নোগ্রাফি দেখাতো, যে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা এবং গ্রুপ সেক্সে লিপ্ত হতো নিয়মিত, একটা পরিবারের জীবনকে যে নিজের সাফল্যের সিঁড়ি বানিয়েছিল।

কলুষতার কারিগর জন মানির তত্ত্বের ব্যাখ্যা তার জীবন। তার নিজের বিকৃত কামনাই তার বিকৃত চিন্তার উৎস। জন মানির জীবনেও এ বইতে বারবার দেখা সেই ছকের প্রতিফলন দেখি আমরা। কলুষতার অন্যান্য কারিগর- উলরিখস, হার্শফেল্ড, কিনসিদের মতো, মানিরও চিন্তা ও তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য ছিল নিজের বিকৃতির অজুহাত তৈরি করা। সমাজে সেগুলোকে বৈধ এবং স্বাভাবিক করে তোলা। সফলও হয়েছিল সে।

মানির চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে মনোবিদ্যা, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে। কিনসির মতোই মানির চিন্তা গভীরভাবে প্রভাবিত করে আধুনিক 'যৌনশিক্ষা'র কাঠামোকে। মানির তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় শিক্ষাক্রম, সরকারি পলিসি, আইন, এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতি। [৩১]

কিনসির মতো জন মানিও এক অমোচনীয় কলংকের দাগ রেখে যায় আধুনিক সমাজে।

সত্তরের দশকে নারীবাদী আন্দোলন দেহ থেকে আলাদা জেন্ডারের ধারণা গ্রহণ করে। জেন্ডার স্টাডিস নামে আলাদা শাস্ত্রই চালু করে ফেলে তারা। ১৯৮০ নাগাদ নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকার আলোচনাতে জেন্ডার শব্দটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ধীরে ধীরে এই শব্দের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রচারকরাও। মানির 'জেন্ডার' তত্ত্ব পশ্চিমা জ্ঞানের জগৎ আর সংস্কৃতিকে এতটাই প্রভাবিত করে যে, এক সময় একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। মানির তত্ত্বের মাধ্যমে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে রূপান্তরিত হবার যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা

৪.১ বাংলাদেশে এলজিবিটি কার্যক্রম শুরুর দিক:

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের কার্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে। [৩২] আলোচনার সুবিধার জন্য এই ইতিহাসকে আমরা চার পর্যায়ে ভাগ করতে পারি,

- প্রথম পর্যায়: এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য
- দ্বিতীয় পর্যায়: গবেষণা এবং যৌন অধিকার
- তৃতীয় পর্যায়: সমকামী অধিকার
- চতুর্থ পর্যায়: যৌন শিক্ষা এবং ট্রান্সজেন্ডার

তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক পর্যায় শেষ হবার পর নতুন আরেক পর্যায় শুরু হয়েছে, ব্যাপারটা তা না। আন্দোলনগুলোর ইতিহাস সাধারণত এমন পরিপাটিভাবে আগায় না। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ওভারল্যাপ থাকে। এখানেও আছে।

এই চারটি পর্যায়ের প্রতিটিতে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায়-

বিদেশি কানেকশন: বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল

- পশ্চিমা ফান্ডিং
- আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক
- দেশীয় এনজিও

বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের কৌশল হলো ধাপে ধাপে আগানো। প্রতি ধাপে তারা নীতিনির্ধারক এবং আমলাদের ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত বা প্রভাবিত করে। এ পদক্ষেপগুলো এমন যে, সেগুলো আলাদাভাবে খুব একটা চোখে পড়ার মতো না; কিন্তু দিনশেষে এগিয়ে যাওয়া যায় ধাপে ধাপে অনেকদূর।

৪.২ মিডিয়া, সুশীল সমাজ, প্রগতিশীল

মোটামুটি শুরু থেকে বাংলাদেশের মিডিয়া, সেলিব্রিটি, তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং প্রগতিশীলরা এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহযোগী বা সমর্থক ভূমিকা পালন করে গেছে। প্রথমে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে। আদর্শিকভাবে না হোক, অন্তত মুখ রক্ষার জন্য হলেও এলজিবিটি আন্দোলনের মতো একটা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের বিরোধিতা করা উচিৎ ছিল তাদের। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে ব্যাপারটাকে আর অদ্ভুত মনে হয় না। এলজিবিটি এজেন্ডার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বৈশ্বিক এনজিও নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশের সুশীল, প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের বড় একটা অংশ যেহেতু এনজিওজীবী, তাই বিরোধিতার কোনো ইচ্ছা থেকে থাকলেও ডলারের গরমে তা উবে গেছে দ্রুত। তাছাড়া প্রগতিশীলরা বিশ্বাসগতভাবেই পশ্চিম থেকে আসা যেকোনো মতবাদকে বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে গ্রহণ করে নেয়। ক্রিটিকালি যাচাই করে না। তাই এলজিবিটি আন্দোলনের বয়ানও তারা গ্রহণ করে নিয়েছে বিনা প্রশ্নে।

৪.৩ শব্দ পরিবর্তন করে

সরাসরি এলজিবিটি বা সমকামী শব্দটা ব্যবহার করে বাংলাদেশে কাজ করা কঠিন। তাই শুরু থেকে এখানে কাজ হয়েছে বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং অ্যাক্রোনিমের (একাধিকার শব্দের একত্রিত সংক্ষিপ্ত রূপ) আড়ালে। যেমন:

- Sexual Health বা যৌন স্বাস্থ্য
- MSM (Men Who Have Sex With Men) বা এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়
- Gender Identity বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়
- SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights) বা যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার
- SOGI (Sexual Orientation And Gender Identity) যৌন রুচি এবং মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়
- SOGISEC (Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression And Sex Characteristic)
- Sexual Minorities বা যৌন সংখ্যালঘু
- Sexual Rights বা যৌন অধিকার
- Sexual Diversity বা যৌন বৈচিত্র্য
- Gender Diversity বা লিঙ্গ বৈচিত্র্য
- GDP (Gender Diverse Person) বা বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষ
- CSE (Comprehensive Sexuality Education) যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা
- ট্র্যান্সজেন্ডার (শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ যে নারী সাজে, অথবা শারীরিকভাবে সুস্থ নারী যে পুরুষ সাজে)

আপাতভাবে পার্থক্য থাকলেও এই সব কথাবার্তার মূল বক্তব্য এক। আর তা হলো, বিকৃত যৌনতা এবং ইচ্ছেমতো নিজের পরিচয় বেছে নেওয়ার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ।

৪.৪ প্রথম পর্যায়

এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে 'এইডস প্রতিরোধ'-এর ব্যানারে বাংলাদেশে কাজ করতে শুরু করে বেশ কিছু দেশি-বিদেশি এনজিও। স্বাভাবিকভাবেই তখন (এবং এখনো) বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তদের প্রায় সবাই ছিল সমকামী অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারী। এইডস নিয়ে কাজ করার অর্থ ছিল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের নিয়ে কাজ করা।

৪.৪.১ শিবানন্দ খান

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে উপমহাদেশে এলজিবিটি নেটওয়ার্ক তৈরিতে আগ্রহী হয়ে উঠে ভারতীয় সমকামী অ্যাকটিভিস্ট শিবানন্দ খান। [৩৩] শিবানন্দ উপমহাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করার জন্য নায ফাউন্ডেশন (NAZ Foundation International) নামে এনজিও তৈরি করে। [৩৪] তার উৎসাহে সমকামী পুরুষদের 'যৌন স্বাস্থ্যসেবা' ও 'সচেতনতা বৃদ্ধি'র লক্ষ্যকে সামনে রেখে **১৯৯৬** সালে বাংলাদেশে তৈরি হয় বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। [৩৫] গবেষক আদনান হোসেইনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নায ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি শুরুতে বন্ধু-কে সহায়তা করেছিল 'ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি অ্যামেরিকান এনজিও। [৩৬] অন্যদিকে বন্ধু'র ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী ৯৬-এ যে প্রকল্প নিয়ে শিবানন্দ খান বাংলাদেশে এসেছিল, সেটাতে সহায়তা দিচ্ছিল অ্যামেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন। [৩৭] অর্থাৎ শুরু থেকেই বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলন আমদানি করা হয়েছিল বিদেশি, বিশেষ করে, পশ্চিমা শক্তিগুলোর মদদে। সাথে ছিল ভারতীয় কানেকশন। এই প্যাটার্নের কথা আমরা আগেই বলেছি। পরেও আমরা এই প্যাটার্ন বারবার দেখতে পাবো।

এইডস মহামারি প্রতিরোধের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সহজেই বন্ধু'র মতো এনজিওগুলো কাজ করার সুযোগ পায়। [৩৮] নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে এনজিওগুলোর কার্যক্রম। কিছুদিনের মধ্যে সমকামী পুরুষদের জন্য ড্রপ ইন সেন্টার (ডিআইসি) নামে ওয়ান স্টপ ক্লিনিক খোলে তারা। [৩৯] বাহ্যিকভাবে যৌন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য তৈরি হলেও ভেতরে ভেতরে এই সেন্টারগুলো হয়ে উঠে প্রচারণা, গণসংযোগ, নেটওয়ার্কিং, কমিউনিটি তৈরি এবং বিকৃতি চর্চার কেন্দ্র। [৪০]

এভাবে শুরু হয় বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রথম ধাপ।

৪.৫ দ্বিতীয় পর্যায়

'স্বাস্থ্য সেবা' থেকে 'যৌন অধিকার' প্রথম দশ বছর কাজ চলে 'এইডস প্রতিরোধ' আর 'যৌন স্বাস্থ্য সেবা'র ব্যানারে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৬/২০০৭ এর দিকে। এ সময়টাতে সমকামীদের পরিন সংখ্যালঘু' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের 'অধিকার'-এর দাবি নিয়ে আলাপ যৌন সুয়া উলরিখসের বানানো সেই পুরোনো কৌশল বাস্তবায়িত হতে শুরু করে বাংলাদেশে। গবেষক ড. আদনান হোসেইন মন্তব্য করেছেন,

সেবা প্রদানের মডেল থেকে সরে এসে যৌন অধিকারের ব্যাপারে জনপরিসরে আলাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রাখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর প্রচেষ্টাগুলো। [৪১]

সমকামী অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের এই সময়কার কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ২০১১ সালে প্রকাশিত Creating A Public Space And Dialogue On Sexuality And Rights. A Case Study From Bangladesh নামের নিবন্ধে। [৪২] নিবন্ধের লেখকরা সবাই ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে কার্যরত ছিলেন, অথবা আছেন। এই লেখকদের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালে সমকামী অধিকার নিয়ে যুক্তরাজ্যে আয়োজিত এক গবেষণা কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণ করার পর বাংলাদেশেও এ ধাচে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তারা। [৪৩] আবারও সেই পশ্চিমা কানেকশন।

সমকামিতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনতা নিয়ে (তাদের ভাষায় 'যৌন বৈচিত্র্য' নিয়ে) আলাপ তোলার জন্য ২০০৭ থেকে বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ এবং মতবিনিময় সভা আয়োজন করতে শুরু করে ব্র্যাক। বিষয়টাকে তারা উপস্থাপন করে মানবাধিকারের কাঠামোতে ফেলে। সমকামিতার সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার' (Sexual And Reproductive Health & Rights -SRHR) নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা।

২০০৭ এর জানুয়ারিতে ব্র্যাকের গবেষকদের উদ্যোগে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। ওয়ার্কশপটির ফান্ডিং করে ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান DFID (Department of International Development)। ওয়ার্কশপের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন এখনো ব্রিটেনের সরকারি সাইটে বিদ্যমান। [৪৪] ২০০৭ এর জুলাইয়ে, জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি' (লিঙ্গ ও যৌনতা) এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করা হয় ব্র্যাক সেন্টারে। ব্র্যাকের গবেষকরা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, যেহেতু কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্র্যাক সেন্টারে এবং আয়োজক ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, তাই (কনফারেন্সের) বিষয়বস্তু বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। আমরা তাই নীতি-নির্ধারক এবং প্র্যাকটিশানারদের (নারীবাদী, অ্যাকটিভিস্ট, গবেষক, অ্যাকাডেমিক, মিডিয়া প্রফেশনাল, ছাত্র, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, এনজিও, সমকামী, লেসবিয়ান এবং ট্রান্সজেন্ডার) বিভিন্ন গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিই। [৪৫]

অল্প কিছুদিন পর ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (IWHC) নামে একটি এনজিও যোগাযোগ করে জানায়, তারা বাংলাদেশে 'যৌন অধিকার' সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনুদান দিতে আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রের এই এনজিও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে জাতিসংঘের পপুলেশন ফান্ড (UNFPA) এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে। এ প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আছে অ্যামেরিকার রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সাথেও। [৪৬]

অনুদানের অর্থ দিয়ে তিনটি কর্মশালা আয়োজন করে ব্র্যাকের গবেষকরা। এর মধ্যে দুটি ছিল প্রশিক্ষণের জন্য আর তৃতীয়টি ফলোআপ। প্রশিক্ষণে তিন ধরনের মানুষকে টার্গেট করা হয়-ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক, মিডিয়ার লোকজন এবং বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত মানুষ। অ্যাকাডেমিক ও মিডিয়ার লোকজনকে এলজিবিটি অধিকারের পক্ষে কথা বলতে উৎসাহিত করা হচ্ছিল, অন্যদিকে সমকামীদের বিভিন্ন সংগঠনকে দেওয়া হচ্ছিল সংগঠিত হবার সুযোগ ও এক্টিভিজম করার প্রশিক্ষণ। [৪৭]

মিডিয়াতে সমকামিতাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার জন্য অভিনব এক কৌশল গ্রহণ করে ব্র্যাকের গবেষকরা। এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মুখ থেকেই শোনা যাক, যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাতে সাংবাদিকদের লেখালেখি করতে

উৎসাহিত করার জন্য আমরা প্রকাশিত প্রতিটি নিউস আইটেম বা গল্পের জন্য সামান্য কিছু আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করি... [৪৮]

২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়টায় আরও কাজকর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে,

'....বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার তাৎপর্য নিয়েও একটি মিটিং আয়োজন করি আমরা। [৪৯] অনুচ্ছেদ ৩৭৭ নিয়ে তাদের মনোযোগী হবার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। উলরিখস, হার্শফেল্ড এবং হ্যারি হেইদের মতো বাংলাদেশেও বিকৃত যৌনতার প্রচারকরা পায়ুসঙ্গমকে বৈধতা দেওয়াকে তাদের মূল লক্ষ্য বানায়। নাম, পরিভাষা, সময় আর স্থান বদলালেও মূল এজেন্ডা থেকে যায় অপরিবর্তিত।

৪.৫.১ প্রভাব বিস্তার

ব্র্যাকের উদ্যোগ বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তারাই বাংলাদেশে প্রথম মানবাধিকারের কাঠামোতে ফেলে বিকৃত যৌনতার পক্ষে আলাপ তোলে। পুরো ব্যাপারটাকে মুন্সিয়ানার সাথে দেখানো হয় 'নিরীহ গবেষণা' হিসেবে। 'সমকামিতার বৈধতা চাই' বলা হলে যেভাবে বাঁধা তৈরি হতো 'গবেষণা'র ক্ষেত্রে তা হয় না; বরং এভাবে তুলে ধরার কারণে অনেকের কাছে বিষয়টা গ্রহণযোগ্যতা পায়। [৫০]

এই 'অবদানের' স্বীকৃতিও পায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২০ সালে ১ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল তৈরি করে জর্জ সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন। এই তহবিলের জন্য পুরো পৃথিবী থেকে ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মনোনীত করা হয়, যার মধ্যে একটি ছিল ব্র্যাক। [৫১]

***

ব্র্যাকের উদ্যোগের পর বাংলাদেশে ক্রমশ এলজিবিটি আন্দোলনের গতি বাড়তে থাকে। বন্ধু'র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ব্র্যাকের আনা মানবাধিকার ও 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার'-এর

আলাপ তাদের প্রচারণা এবং কার্যক্রমের মধ্যে যুক্ত করে নেয়। মিডিয়া, অ্যাকাডেমিক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এলজিবিটি এজেন্ডার সমর্থনে কিছু মানুষ তৈরি হয়। পাশাপাশি বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত লোকেরা অ্যাডভোকেসি এবং অ্যাকটিভিসম সংক্রান্ত জরুরি প্রশিক্ষণ পায় ওয়ার্কশপগুলোতে। সক্রিয় হয়ে উঠে বিভিন্ন এলজিবিটি সংগঠন। এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আগ্রহী হয় বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সমকামী আন্দোলন শুরু করার প্রতি। আর এভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়।

৪.৬ তৃতীয় পর্যায়

প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাকটিভিসম নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেট চ্যাট গ্রুপ আর ফোরামের মাধ্যমে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত ব্যক্তিদের এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে বাংলাদেশে। **১৯৯৯** সালে রেঙ্গু নামে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি 'গে বাংলাদেশ' নামে একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করে। এটি ছিল বাংলাদেশে এ ধরনের প্রথম গ্রুপ। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্য রেঙ্গু জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় পশ্চিমে কাটিয়েছিল।

বাংলাদেশের এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের প্রতিটা ধাপেই বিদেশি কানেকশন খুঁজে পাওয়া যায়। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের শুরু বিলেতফেরত ভারতীয় শিবানন্দ খানের মাধ্যমে। ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের 'অনুপ্রেরণা' আসে ব্রিটেনে কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণের পর। আর সমকামী ই-গ্রুপগুলোর পথচলা শুরু হয় বিদেশফেরত রেঙ্গুর মাধ্যমে। ২০০৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় রেঙ্গু। গে বাংলাদেশের কার্যক্রম থেমে যায় সেখানেই। [৫২]

৪.৬.১ বয়েস অফ বাংলাদেশ (বব)

'গে বাংলাদেশ' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০২ গড়ে উঠে আরেকটি ই-গ্রুপ, বয়েস অফ বাংলাদেশ (Boys of Bangladesh/BoB)। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে 'গেট টুগেদার' এবং 'ডিজে পার্টি'র আয়োজন করতে শুরু করে বব। প্রথম পাঁচ বছর বব-এর কার্যক্রম অনলাইন নেটওয়ার্কিং আর অফলাইন 'ডিজে পার্টি'র মধ্যে সীমিত থাকে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৭ থেকে। সে বছর ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে বব। এই ওয়ার্কশপের পর অ্যাক্টিভিসমে আগ্রহী হয়ে উঠে তারা।

২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতীক রংধনু পতাকা টাঙ্গিয়ে ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটের ছাদের ক্যাফেতে অনুষ্ঠান করে বব। একে বাংলাদেশে কোনো সমকামী সংগঠনের প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। [৫৩] বাংলাদেশে সমকামী সংগঠনগুলোর অধিকাংশ প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হয়েছে জার্মান ইনস্টিটিউট, ব্রিটিশ কাউন্সিল বা আলিয়স ফ্রঁসেজ এর প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এখানেও সেই একই পশ্চিমা কানেকশন।

২০০৯ সালে কক্সবাজারের হোটেল সী গালে ওয়ার্কশপ আয়োজন করে বব। ওয়ার্কশপে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রথমত, বিকৃত যৌনতার বৈধতা আদায়ের জন্য জোট গঠন। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিলের জন্য কাজ করা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯-এ জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে ৩৭৭ ধারা বাতিলের সুপারিশ করা হয়। জাতিসংঘে জমা দেওয়া বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে এসআরআই (সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ-SRI) নামে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। আর এসআরআই-কে সহযোগিতা করে বব। [৫৪] বয়েস অফ বাংলাদেশের মতো একটি অনিবন্ধিত, ইন্টারনেটকেন্দ্রিক সংগঠন কত সহজে জাতিসংঘ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, তা থেকে বৈশ্বিক এলজিবিটি মাফিয়ার শক্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

২০১৩ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্কের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায় বব। এ বছর আবারও জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে বাংলাদেশ

সরকারকে ৩৭৭ নম্বর সেকশন বাতিল করতে বলা হলে বাংলাদেশ তা প্রত্যাখ্যান করে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে এই সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না। [৫৫]

২০১৩ এর এপ্রিল ও মে মাসে ব্র্যাক জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আর বয়েস অফ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে দুটি গোলটেবিল বৈঠক হয়। বাংলাদেশে এলজিবিটি অধিকার আন্দোলনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আলোচনা হয় তা নিয়ে। এ অনুষ্ঠানে সমকামী সংগঠনগুলোর সদস্য এবং ব্র্যাকের গবেষকদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দূতাবাস এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও।

২০১৪ সালে মার্কিন সরকারের স্টেইট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে 'প্রজেক্ট ধী' নামে একটি প্রকল্প শুরু করে বব। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে মুন্সিগঞ্জের একটি রিসোর্টে দুই দিন ব্যাপী 'ধী রেসিডেন্সি' নামের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে খ্যাতি পাওয়া অনেকেই বয়েস অফ বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধী রেসিডেন্সিতে অংশ নেয়।

এ বছরের অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'ধী' নামে কমিকবুক, যার প্রধান চরিত্র হলো একজন সমকামী নারী। এই কমিকের মোড়ক উন্মোচন হয় ব্রিটিশ কাউন্সিলে। ডেইলি স্টার এবং ডয়েচে ভেলের মতো মিডিয়াগুলো অনুষ্ঠানটি নিয়ে ইতিবাচকভাবে নিউজ করে। প্রজেক্ট ধী'র অংশ হিসেবে ২০১৬ নাগাদ দেশের ১৩টি জেলায় অনুষ্ঠান আয়োজন করে বয়েস অফ বাংলাদেশ।

৪.৬.২ ম্যাগাজিন এর মাধ্যমে

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে এবং বব-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে গড়ে উঠে আরও কিছু সমকামী সংগঠন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'রূপবান'। ২০১১ থেকে নেটওয়ার্কিং শুরু করলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তারা আত্মপ্রকাশ করে ২০১৪ সালে, 'রূপবান' নামে দেশের প্রথম সমকামী ম্যাগাজিন প্রকাশের মাধ্যমে। এই ম্যাগাজিনের প্রচারণা চলে প্রিন্ট মিডিয়া এবং অনলাইনে। ব্রিটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত রূপবানের প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় তৎকালীন ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ আরও অনেকে। ম্যাগাজিনটির প্রকাশনার খবর ফলাও করে প্রচার করে ডেইলি স্টার, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা ট্রিবিউন, বিবিসিসহ বিভিন্ন পত্রিকা ও গণমাধ্যম।[৪০] বরাবরের মতো এখানেও সেই পশ্চিমা কানেকশন। রূপবানের প্রধান উদ্যোক্তা জুলহাস মান্নান মার্কিন দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা। ইউএসএইডের সাথেও তার সম্পর্ক ছিল।

সমকামী অ্যাকটিভিস্ট তৈরির জন্য 'ইয়ুথ লিডারশীপ প্রোগ্রাম' নামে দেশজুড়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ আয়োজন করে রূপবান। প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের দিক থেকে রূপবান বেশ অনেকটা ছাড়িয়ে যায় বব-কে। ২০১৪ এবং ২০১৫-তে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে আয়োজন করে 'রংধনু র‍্যালি’। শাহবাগে রংবেরঙের পোশাক পরে মিছিল করে হিজড়া এবং সমকামী পুরুষরা। এ সময়টাতে রূপবান দুটি 'ফ্যাশন শো' ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যেগুলোর মূল থিম ছিল ট্রান্সজেন্ডার ও ক্রসড্রেসিং। অর্থাৎ সমকামী পুরুষদের নারীর পোশাকে সাজা। ট্রান্সজেন্ডারবাদের সাথে সমকামিতার সম্পর্কের বিষয়টি লুকানোর কোনো চেষ্টা এই সময়টাতে ছিল না।

নিষিদ্ধ সংগঠন আল-কায়েদা জুলহাস মান্নান ও তার সহগামী মাহবুবকে ২০১৬ সালে হত্যা করার পর স্তিমিত হয়ে আসে রূপবানসহ অন্যান্য সমকামী সংগঠনের কার্যক্রম। দেশ ছেড়ে চলে যায় অনেক অ্যাক্টিভিস্ট। প্রায় বন্ধ হয়ে যায় সমকামী অধিকার নিয়ে প্রকাশ্য কার্যক্রম। এমন পরিস্থিতিতে শুরু হয় বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়।

৪.৭ চতুর্থ পর্যায়

২০১৬ সালের পর বাংলাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সামনে আনে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে। এই পরিবর্তনের পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। ২০১৫-এর পর থেকে পশ্চিমা দাতারা ক্রমেই ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে অর্থায়নও শুরু করে আন্তর্জাতিক সংস্থা

এবং দাতারা। সামাজিক প্রেক্ষাপট, দাতাদের পছন্দ, কৌশল মূল্যায়নসহ নানা দিক বিবেচনা করে দেশীয় এনজিও এবং সংগঠনগুলো ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে সামনে রেখে কাজে মনোযোগী হয়। আর এজন্য কাজে লাগায় হিজড়া ও তৃতীয় লিঙ্গের মতো শব্দগুলিকে।

৪.৭.১ হিজড়া নিয়ে অ্যাকটিভিসম

২০০০ সালে কেয়ার বাংলাদেশের অর্থায়নে 'বাঁধন হিজড়া সঙ্ঘ' নামে একটি এনজিও গড়ে ওঠে। পরের বছর হিজড়াদের নিয়ে কাজ করার জন্য 'সুস্থ জীবন' নামে একটি এনজিও তৈরি করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ২০১০ নাগাদ হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এনজিওগুলোর কাজ ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। তবে এসব এনজিও'র মাধ্যমে হিজড়া সম্প্রদায়ের লাভ কতটুকু হয়েছে তা নিয়ে আছে মিশ্র অনুভূতি। হিজড়াদের অনেকে মনে করেন এনজিও চালানো লোকেরা নিজেরা প্রচুর টাকা কামিয়ে নিলেও গরিব হিজড়াদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি।

২০০৭-এর পর এনজিওগুলো 'যৌন স্বাস্থ্য'-এর বদলে 'অধিকার'-এর আলাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ সময় উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠে। এই দাবির পেছনেও মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। নেপালে এবং পাকিস্তানের পর, ২০১৩ সালে বাংলাদেশেও তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়

হিজড়াদের। দেশীয় এনজিও, তাদের বিদেশি ডোনার আর বৈশ্বিক এলজিবিটি আন্দোলন এই স্বীকৃতিকে দেখে তাদের সাফল্য হিসেবে। ২০১৫-তে ঢাকায় ব্যাপক জাঁকজমকের সাথে 'হিজড়া প্রাইড' নামে মিছিল আয়োজন করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আমরা এরই মধ্যে দেখেছি 'প্রাইড প্যারেড' বা 'প্রাইড মিছিলের' ধারণাটা সরাসরি অ্যামেরিকান সমকামী আন্দোলন থেকে আসা। এই মিছিলে হিজড়াদের পাশাপাশি দেখা যায় বিভিন্ন পশ্চিমা দূতাবাস আর দাতা সংস্থার কর্মকর্তাদের। হিজড়াদের তারা সংজ্ঞায়িত করে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে এমন মানুষকে বোঝায় যাদের জন্মগতভাবে 'যৌন এবং লিঙ্গ প্রতিবন্ধী'। অর্থাৎ হিজড়া বলতে মানুষ ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের বোঝায়। যেহেতু তাদের সমস্যা জন্মগত, এর ওপর তাদের কোনো হাত নেই, তাই এ ধরনের মানুষের প্রতি সমাজের সহানুভূতি আছে। সরকারি স্বীকৃতিতেও হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে'। যাদের জন্মগত সমস্যা আছে শুধু তাদেরকেই হিজড়া হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ হিজড়ার সংজ্ঞা নিয়ে আন্তর্জাতিক এলজবিটি নেটওয়ার্ক আর বাংলাদেশের সমাজ ও সরকারের অবস্থানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৪.৭.২ হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার: শব্দের রাজনীতি

২০১৫ সালে সামাজিকীকরণের অংশ হিসেবে মোট চৌদ্দজন হিজড়াকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ে চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর মেডিক্যাল টেস্টে দেখা যায় ঢাকা থেকে বাছাই করা ১২ জন হিজড়ার মধ্যে ১১ জনেরই লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ আছে। তারা সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ। বাকি একজনও জন্মগতভাবে সুস্থ পুরুষ ছিল, এই পরীক্ষার বছর দুই আগে স্বেচ্ছায় সার্জারি করে নিজের লিঙ্গ আর অন্ডকোষ অপসারণ করেছে সে। এর পর বারো জনেরই অ্যাপয়ন্টমেন্ট বাতিল করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠনগুলো তাদের অবস্থানে পরিবর্তন আনে।

প্রথমত, তারা হিজড়া সনাক্তকরণে শারীরিক পরীক্ষা বাদ দিতে বলে।

দ্বিতীয়ত, হিজড়ার পাশাপাশি ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা সামনে আনতে শুরু করে।

শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারে তারা দাবি করে বসে, এতে নাকি যৌন হয়রানি হচ্ছে। অথচ ক্যাডেট কলেজ থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী, বুয়েটের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসে কাজ করা মানুষদের ক্ষেত্রে শারীরিক পরীক্ষা হয় নিয়মমাফিক, এ নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। কেবল হিজড়াদের ক্ষেত্রেই সমস্যা! যেখানে হিজড়াদের বিশেষ সুবিধা এবং স্বীকৃতি দেওয়াই হচ্ছে 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হবার কারণে, সেখানে শারীরিক পরীক্ষা আবশ্যক। কোনো মানুষ যদি অন্ধ বা বধির হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পায়, ভাতা পায়, তাহলে সে আসলেই অন্ধ বা বধির কি না, তা যাচাই করা জরুরি। হিজড়াদের শারীরিক পরীক্ষা নিয়ে এই আপত্তি তাই একেবারেই অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, তা ব্যাখ্যা করি।

এলজিবিটি নেটওয়ার্ক চায় ট্রান্সজেন্ডারবাদের স্বীকৃতি। তারা মনে করেছিল, হিজড়াদের স্বীকৃতির মাধ্যমে এটা অর্জিত হবে। কিন্তু গন্ডগোল বাঁধলো যখন সরকারিভাবে হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হলো 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হিসেবে। কারণ, এভাবে সংজ্ঞা দেওয়ার ফলে, শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারটা চলে আসলো। আর পরীক্ষা হলে স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তন করা লোকেরা কিংবা অপারেশন ছাড়াই নারী সাজা পুরুষেরা ধরা পড়ে যাবে। এদের মধ্যে আগে যারা হিজড়া বলে পরিচিত ছিল, ধরা পড়বে তারাও। অর্থাৎ ২০১৩-এর স্বীকৃতির ফলে এলজিবিটি নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য তো অর্জিত হলোই না, উল্টো দেখা দিলো সমস্যা।

এ পরিস্থিতিতে তাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল,

- হিজড়া শব্দকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা অথবা
- হিজড়ার পাশাপাশি আইনে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটাও যুক্ত করা।

হিজড়াকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা আছে। পত্রপত্রিকাতে প্রায়ই পথেঘাটে চাঁদাবাজি, বাসাবাড়িতে হানা দেওয়া, দেহব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে হিজড়াদের যুক্ত থাকার খবর দেখা যায়। এ ধরনের কার্যকলাপের কারণে সমাজের অনেকের মধ্যে ক্ষোভ আছে। তবু সমাজ হিজড়াদের জায়গা দিচ্ছে, কারণ মানুষ মনে

করে হিজড়ারা জন্মগতভাবে যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। এ অবস্থার ওপর তাদের কোনো হাত নেই এবং তাদের প্রতি সমাজের একটা দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কেউ যদি এখন বলে বসে-হিজড়া আসলে শুধু জন্মগত সমস্যাযুক্ত মানুষ না, বরং শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষও স্বেচ্ছায় হিজড়া হতে পারে-ঐ সহানুভূতিটুকু তখন আর থাকে না। কিছু পুরুষ স্বেচ্ছায় নারী সাজছে, সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উপদ্রব করছে, নানা অপরাধ করে বেড়াচ্ছে, তারপর তারাই আবার সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুবিধা চাইছে-এটা সমাজ মেনে নেবে না। সহানুভূতি উবে যাবে, থেকে যাবে ক্ষোভ। যার ফলাফল ভালো হবে না। কাজেই হিজড়া শব্দকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।

বাংলাদেশে সক্রিয় এলজিবিটি নেটওয়ার্ক তাই বেছে নেয় দ্বিতীয় রাস্তা। জোর দিতে শুরু করে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের ওপর। এতে করে একদিকে হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডারকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে 'ট্রান্সজেন্ডার'দের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা যায়। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটাকে আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আইনে ঢুকিয়ে দেওয়া গেলে তৈরি হয়ে যায় সমকামিতার বৈধতার পথ। কারণ, ট্রান্সজেন্ডারবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি।

এলজিবিটি অ্যাকটিভিস্টরা এসময় থেকে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটাকে সামনে আনতে শুরু করে। তারা আরও দুটি কাজ করে। তারা 'তৃতীয় লিঙ্গ' কথাটার বিরোধিতা করে। কারণ, তৃতীয় লিঙ্গ দ্বারা আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষ বোঝানো হয়। কিন্তু তাদের দরকার মনে মনে 'মনে হওয়া'-র স্বীকৃতি। অন্যদিকে তারা বলতে শুরু করে, 'হিজড়া' কোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় না, এটি একটি সংস্কৃতি'।

এ কথা বলার মূল কারণ হলো, আইনে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা ঢোকানোর অজুহাত তৈরি করা। তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, হিজড়াদের তো স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে গেছে, তোমরা ট্রান্সজেন্ডার শব্দ নিয়ে এত মাতামাতি করছো কেন? তখন তারা বলবে, 'হিজড়া কোনো জেন্ডার না, এটা একটি সংস্কৃতি। আর যেহেতু এটা নির্দিষ্ট একটা সংস্কৃতি তাই অনেকে এই সংস্কৃতি নিজের মধ্যে ধারণ না-ও করতে পারে। হিজড়া নামে নিজেকে পরিচয় না-ও দিতে পারে তারা। তাদের জন্য ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা ব্যবহার করা উচিৎ। এই কারণে আইনের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা থাকা দরকার।'

আদতে মূল কারণ হলো, সুস্থ পুরুষের নারী পরিচয় দিয়ে এবং সুস্থ নারীর পুরুষ পরিচয় দিয়ে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার সামাজিক ও আইনি বৈধতা তৈরি। এই হলো হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার শব্দের পেছনের রাজনীতি।

৪.৮ ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে কার্যক্রম

নতুন কৌশল নেবার পর থেকে গত ৭-৮ বছরে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে ব্যাপক কার্যক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের এলজিবিটি নেটওয়ার্ক বর্তমানে তাদের পুরো শক্তি একত্রিত করেছে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

আইন

বাংলাদেশে রীতিমতো আইন প্রনয়ন করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর, সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকায় প্রকাশিত 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে' শিরোনামে এক খবরে বলা হয়েছে,

'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।...'[৫৬]

অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে এ ধরনের বিকৃতিতে মূলস্রোতে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আর তা করা হচ্ছে অধিকারের নামে। ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত 'সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা', শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ 'শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, '... এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। [৫৭]

যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ আইনের খসড়া হয়েছে এবং তা পাস করানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়ার পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, বিভিন্ন এনজিও এবং মার্কিন সরকার। বিষয়টি উঠে এসেছে মার্কিন রাজনীতিবিদদের বক্তব্যেই।

মার্কিন কানেকশন

২০২৪ এর জানুয়ারিতে মার্কিন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা এবং ফ্লোরিডা রাজ্যের গর্ভনর রন ডিস্যান্টিস বলেছেন, বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে। এটা অ্যামেরিকান জনগণের দেওয়া ট্যাক্সের অপচয়। অন্যদিকে রন ডিস্যান্টিসের বক্তব্যের সূত্র ধরে সিএনএন জানিয়েছে, এই প্রকল্প বাইডেনের সময়ে শুরু হয়নি, ২০১৮ সালে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে শুরু হয়েছে। অর্থাৎ, অ্যামেরিকার প্রধান দুই রাজনৈতিক দলই বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একমত।

ইউএসএইডের যে প্রতিবেদনগুলোর বরাতে রন ডিস্যান্টিস অভিযোগ করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনকে তারা সহায়তা দিচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ২০২১ সালের আদমশুমারিতে প্রথমবারের মতো 'তৃতীয় লিঙ্গ'-এর জন্য আলাদা ঘর যুক্ত হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে,

লিঙ্গ বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রকল্পে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি ট্রান্সজেন্ডার আইনের খসড়া জমা দিয়েছে, যাতে যৌন বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং অন্যান্য অধিকার বৃদ্ধি পায়।

অর্থাৎ, বাংলাদেশ ট্রান্সজেন্ডার আইনের খসড়া তৈরি করেছে 'নাগরিক সংগঠন'গুলো, তাও আবার ইউএসএইডের অর্থায়নে। সেই নাগরিক সংগঠন কারা? এ প্রশ্নের উত্তর আছে ইউএসএইডের আরেক প্রতিবেদনে। Final Performance Evaluation For USAID's Rights For Gender Diverse Populations (RGDP) Activity (২০২১), শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রচারের প্রকল্পের টাকা দেওয়া হয়েছে 'বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'কে।

ট্রান্সজেন্ডার আইনের পেছনে বন্ধু'র ভূমিকার কথা উঠে এসেছে তাদের নিজস্ব প্রতিবেদনেও। বন্ধু'র ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

'সমাজসেবা অধিদফতর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্ধুর সাথে সহযোগিতা করেছে এবং ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন বাংলাদেশের খসড়া প্রস্তুত করেছে।'[৫৮]

এই সহযোগিতা ঠিক কেমন তার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, বন্ধু'র আরেকটি প্রতিবেদনে। এ প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করেছে বন্ধু-ই। তারপর তারা সেটা জমা দিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে।

টাইমলাইনটা লক্ষ্য করুন। বন্ধু এবং তাদের অ্যামেরিকান মনিবরা বলছে, ২০২১ সালে তারা খসড়া বানিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে ২০২২ এর মার্চ মাসে সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখছি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে বলা হচ্ছে, '...আমরা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি...'। তারপর আবার ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরে বলা হচ্ছে 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে'। সবশেষে ২০২৩ এর ডিসেম্বরে পত্রিকায় এসেছে, 'ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে'।

অর্থাৎ এজেন্ডা আর পয়সা দিয়েছে অ্যামেরিকা ও এডিবি, তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আইনের খসড়া বানিয়েছে বন্ধু, আর সেটাই গৃহীত হয়ে গেছে।

ওপরের তথ্যগুলো ও স্বীকারোক্তি থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে অ্যামেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের নির্দেশনায় এবং এটি করা হচ্ছে বৈশ্বিক এলজিবিটি এজেন্ডার অংশ হিসেবে।

৪.৯ শিক্ষাক্ষেত্রে

সামাজিকভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার জন্য চলমান নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং অবাধ যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ। এখানে কাজ চলছে দুইটি ধারায়। একটি হলো সরাসরি

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের শিক্ষা। অন্যটি হলো যৌন শিক্ষার নামে অবাধ, বিকৃত যৌনতা এবং এলজিবিটি মতবাদের স্বাভাবিকীকরণ।

৪.৯.১ পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB-এর ২০২৩ সালের সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্রান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠায় দেওয়া গল্পে মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'

এ গল্পে 'শরীফা' নিজেই স্বীকার করছে, ছোটবেলায় সে ছেলে ছিল। নাম ছিল শরীফ আহমেদ। যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সে নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে। ৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

...আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্রান্সজেন্ডার।'

একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

..ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।'

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।'

বইয়ের ৩৯ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে **ট্রান্সজেন্ডার তথা এলজিবিটিকিউ** নামক বিকৃত মতাদর্শের প্রচার এবং স্বাভাবিকীকরন।

অধ্যায়টি শুরু হয়েছে বেদে সম্প্রদায়ের আলোচনা দিয়ে। এখানে বেদেদের সমাজ, সংস্কৃতি এবং যাপিতজীবনের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেদে সম্প্রদায়ের মেয়েরা বাইরে কাজ করে এবং ঘরের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় আর ছেলেরা বাচ্চাকাচ্চা ও ঘর সামলায়। এ বিষয়টা এখানে বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

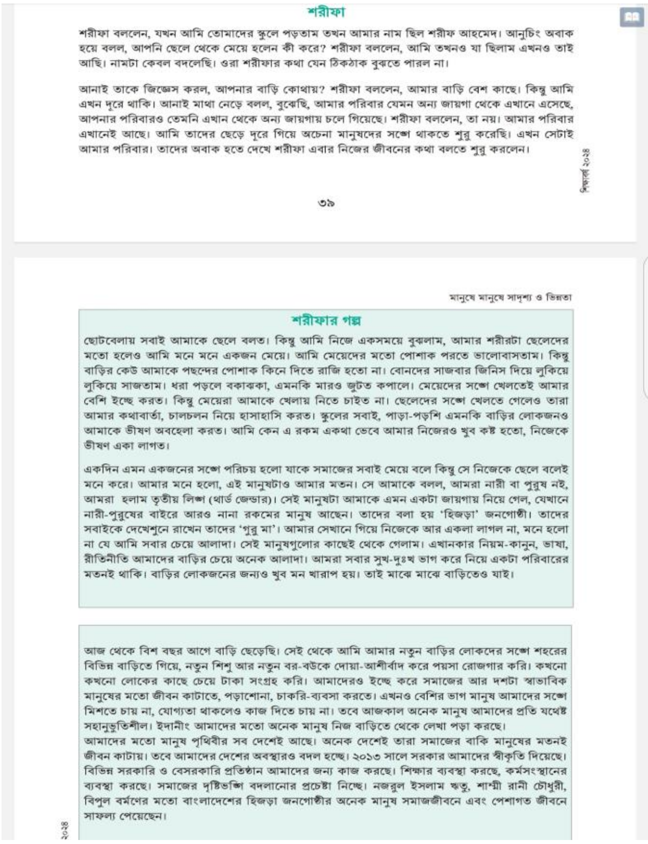
আপাতদৃষ্টিতে, এ আলোচনায় আপত্তির সুযোগ নেই। এখানে সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। তবে, এখানে বাচ্চাদের মাথায় **বৈচিত্র্যের** বিষয়টা ঢুকিয়ে দিয়ে একটু পরেই লিঙ্গবৈচিত্রের ইস্যুটা সামনে আনা হয়েছে যেন বাচ্চারা সহজে সেটা গ্রহন করতে পারে। ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের মূল থিমই হচ্ছে ডায়ভার্সিটি বা বৈচিত্র্য। বাচ্চারা এখন ভাববে ঠিকই তো আছে, একটু আগেই তো পড়লাম নানারকম মানুষ থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

এগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা ট্রান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের বক্তব্য। উলরিখস, হার্শফেল্ড, দ্য বোভয়া, জন মানি, হ্যারি বেঞ্জামিন, শুলামিথ ফায়ারস্টোন, জুডিথ বাটলার আর জুলিয়া সেরানোদের চিন্তার জগাখিচুড়ি মিশেল। তীব্র প্রতিবাদের মুখে ২০২৪ সালের সংস্করণে 'ট্রান্সজেন্ডার' শব্দটা বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু মূল বক্তব্য থেকে যায় একই।

২৪ সালের বইয়ে শরীফার গল্প এসেছে ৩৯-৪৪ পৃষ্ঠায়। ৪০ পৃষ্ঠায় এখনো বলা হচ্ছে- 'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'। নতুন বইয়েও শোনানো হয়েছে সেই একই ছোটবেলায় ছেলে, তারপর নিজেকে মেয়ে ভাবা, শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার গল্প। ৪২ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় বাচ্চাদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে,

'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের।



শরীফা

শরীফা বললেন, যখন আমি তোমাদের স্কুলে পড়তাম তখন আমার নাম ছিল শরীফ আহমেদ। আনুচিং অবাক হয়ে বলল, আপনি ছেলে থেকে মেয়ে হলেন কী করে? শরীফা বললেন, আমি তখনও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। নামটা কেবল বদলেছি। ওরা শরীফার কথা যেন ঠিকঠাক বুঝতে পারল না।

আনাই তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায়? শরীফা বললেন, আমার বাড়ি বেশ কাছে। কিন্তু আমি এখন দূরে থাকি। আনাই মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, আমার পরিবার যেমন অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছে, আপনার পরিবারও তেমনি এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। শরীফা বললেন, তা নয়। আমার পরিবার এখানেই আছে। আমি তাদের ছেড়ে দূরে গিয়ে অচেনা মানুষদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছি। এখন সেটাই আমার পরিবার। তাদের অবাক হতে দেখে শরীফা এবার নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৩৯

মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা

শরীফার গল্প

ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজতাম। ধরা পড়লে বকাঝকা, এমনকি মারও জুটত কপালে। মেয়েদের সঙ্গে খেলতেই আমার বেশি ইচ্ছে করত। কিন্তু মেয়েরা আমাকে খেলায় নিতে চাইত না। ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলেও তারা আমার কথাবার্তা, চালচলন নিয়ে হাসাহাসি করত। স্কুলের সবাই, পাড়া-পড়শি এমনকি বাড়ির লোকজনও আমাকে ভীষণ অবহেলা করত। আমি কেন এ রকম একথা ভেবে আমার নিজেরও খুব কষ্ট হতো, নিজেকে ভীষণ একা লাগত।

একদিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম তৃতীয় লিঙ্গ (থার্ড জেন্ডার)। সেই মানুষটা আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে নারী-পুরুষের বাইরে আরও নানা রকমের মানুষ আছেন। তাদের বলা হয় 'হিজড়া' জনগোষ্ঠী। তাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন তাদের 'গুরু মা'। আমার সেখানে গিয়ে নিজেকে আর একলা লাগল না, মনে হলো না যে আমি সবার চেয়ে আলাদা। সেই মানুষগুলোর কাছেই থেকে গেলাম। এখানকার নিয়ম-কানুন, ভাষা, রীতিনীতি আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা। আমরা সবার সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়ে একটা পরিবারের মতনই থাকি। বাড়ির লোকজনের জন্যও খুব মন খারাপ হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়িতেও যাই।

আজ থেকে বিশ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছি। সেই থেকে আমি আমার নতুন বাড়ির লোকদের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে, নতুন শিশু আর নতুন বর-বউকে দোয়া-আশীর্বাদ করে পয়সা রোজগার করি। কখনো কখনো লোকের কাছে চেয়ে টাকা সংগ্রহ করি। আমাদেরও ইচ্ছে করে সমাজের আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন কাটাতে, পড়াশোনা, চাকরি-ব্যবসা করতে। এখনও বেশির ভাগ মানুষ আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় না, যোগ্যতা থাকলেও কাজ দিতে চায় না। তবে আজকাল অনেক মানুষ আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভুতিশীল। ইদানীং আমাদের মতো অনেক মানুষ নিজ বাড়িতে থেকে লেখা পড়া করছে।
আমাদের মতো মানুষ পৃথিবীর সব দেশেই আছে। অনেক দেশেই তারা সমাজের বাকি মানুষের মতনই জীবন কাটায়। তবে আমাদের দেশের অবস্থারও বদল হচ্ছে। ২০১৩ সালে সরকার আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য কাজ করছে। শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রচেষ্টা নিচ্ছে। নজরুল ইসলাম ঋতু, শাম্মী রানী চৌধুরী, বিপুল বর্মণের মতো বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষ সমাজজীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন।

২০২৪

৪.৯.২ শরীফার গল্প কি আসলে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে?

আগের অধ্যায়গুলোর আলোচনার আলোকে যে-কেউ বুঝবেন 'শরীফার গল্প' ট্রান্সজেন্ডার নামের বিকৃতি নিয়ে। বিষয়টি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু অজ্ঞতা অথবা অন্য কোনো অজানা কারণে অনেকেই এ গল্পের সাথে ট্রান্সজেন্ডারবাদের সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। তাই স্পষ্ট বিষয়টাই আবার স্পষ্ট করে দিই।

দেখুন, গল্পটিতে প্রথমে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শরীফ জন্মেছে একজন সুস্থ পুরুষ হিসেবে। শারীরিকভাবে সে ত্রুটিহীন। কিন্তু নিজেকে সে নারী 'মনে করে'। তারপর গল্প গেছে হিজড়া নিয়ে আলোচনায়। অথচ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান অনুযায়ী হিজড়া হলো 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' মানুষ। হিজড়াদের সমস্যা শারীরিক ও জন্মগত। অন্যদিকে শরীফ সুস্থ পুরুষের শরীর নিয়ে নিজেকে নারী বলে পরিচয় দিচ্ছে, যা মানসিক বিকৃতি। শরীফ হিজড়া না। কাজেই এ 'গল্পকে' কোনোভাবেই হিজড়াদের সাথে মিলিয়ে ফেলা যায় না।

এখানে ট্রান্সজেন্ডারবাদের বয়ানকে তুলে ধরা হয়েছে, যার মূল বক্তব্য হলো- একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি নিজেকে নারী দাবি করে তাহলে সে

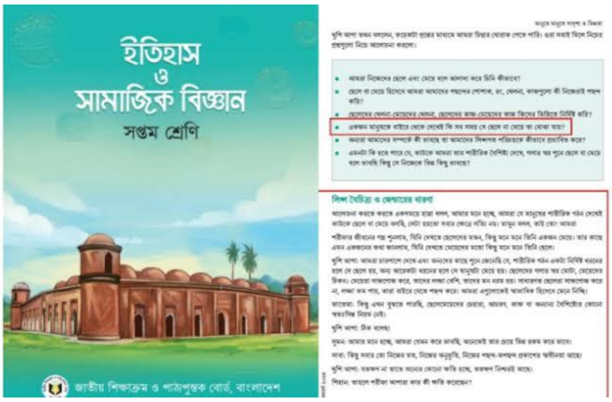
নারী। আবার নারীদেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে তাহলে সে পুরুষ।

'হিজড়া' শব্দ ব্যবহার হলেও পুরো গল্পে বর্ণনা এসেছে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে, আপনি গরু রচনা লেখলেন; কিন্তু বর্ণনা দিলেন জলহস্তীর। তারপর বললেন এখানে জলহস্তী কোথায় আছে, আমি তো লিখেছি গরু! এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যখন আমরা দেখি যে, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষের বইতে এবং শিক্ষা গাইডেও সরাসরি ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিই এসেছিল। [8]

৪.৯.৩ পাঠ্যবইয়ে এই মতবাদ আসলো কীভাবে?

পাঠ্যবইয়ে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ঢোকানোর পেছনে আছে এনজিও এবং এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। এ ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকার কথা খোলাখুলি স্বীকার করেছে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপার্সন এবং নির্বাহী পরিচালককের লেখায় বলা হচ্ছে,

'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সাথে দৃঢ় লবিয়িং এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া এবং লিঙ্গ রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত (কম্প্রিহেনসিভ) অংশ সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'একই প্রতিবেদনের ৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, এই আলোচনাগুলো এসেছে 'ক্লাস সেভেনের এর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে'।



শিক্ষাক্রমে এনজিওদের প্রভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে দেশের সংবাদপত্রগুলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও। ২৫শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত 'গোঁজামিলে তৈরি হচ্ছে নতুন কারিকুলাম' প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) নির্দেশিকাতেই নতুন শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে.. অভিযোগ রয়েছে, ১৫ সদস্যের ওই গ্রুপের ছয়জন সদস্যকে বাইপাস করে ইউনিসেফ, প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কারিকুলাম তৈরির কাজ হচ্ছে।

৪.৯.৪ যৌন শিক্ষা ও এলজিবিটি

যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ এবং বৈধতার পেছনে কথিত 'যৌন শিক্ষা'র ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। শিশু-কিশোরদের মাথায় শুরুতেই যদি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়-মানুষ ইচ্ছেমতো যৌনসঙ্গী বেছে নিতে পারে, ইচ্ছেমতো যৌনতায় লিপ্ত হতে পারে, নিজের পরিচয় বেছে নিতে পারে ইচ্ছেমতো, সবই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয়-তাহলে এক প্রজন্মের মধ্যেই সমাজের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ধরনের অবনতি নিয়ে আসা সম্ভব। আর আমরা আগেই জেনেছি, যৌন শিক্ষার ব্যানারে 'কম্প্রিহেনসিভ সেক্সুয়াল এডুকেশান' নামে আজ যে কারিকুলাম বৈশ্বিকভাবে প্রচার করা হচ্ছে, তা তৈরি হয়েছে কলুষতার কারিগর অ্যালফ্রেড কিনসির বিকৃত ও জোচ্চুরিভরা গবেষণার ভিত্তির ওপর।

ইউনিসেফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওদের ক্রমাগত চাপে ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে যৌন শিক্ষার অংশ যুক্ত করা হয়। এসব অংশ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে অভিভাবক, সাধারণ জনগণ, এমনকি শিক্ষকরাও। প্রতিবাদের মুখে ২০১৪/১৫ সালে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না পশ্চিমারা। ২০১৬ সালে সুইডেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সিডা (SIDA), আঞ্চলিক নারীবাদী এনজিও অ্যারো (ARROW), এবং দেশীয় নারীবাদী এনজিও 'নারীপক্ষ'- এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যৌন শিক্ষার অবস্থা নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। 'সহায়তা' দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ প্রতিবেদনে পাঠ্যবইগুলোর যৌন শিক্ষা অংশের বেশ কিছু দিকের সমালোচনা করা হয়। যেমন:

- বইগুলোতে পর্নোগ্রাফি দেখার মতো কাজগুলোকে সমাজের জন্য হুমকি বলা হয়েছে।
- মাদরাসা বোর্ডের বইতে বলা হয়েছে যিনা, সমকামিতা হারাম।
- বলা হয়েছে, যৌনতা কেবল স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে।

অর্থাৎ এনজিওদের মতে, শিশু-কিশোরদের শেখানো উচিৎ পর্নোগ্রাফি সমাজের জন্য হুমকি না, যিনা এবং সমকামিতা নিষিদ্ধ কিছু না, আর যৌনতা কেবল স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যৌন শিক্ষা কারিকুলামের ব্যাপারে সমাজের নেতিবাচক

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'ইসলামী উগ্রবাদের' সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এ প্রতিবেদনের লেখিকা!

একই সুরে, ব্র্যাকের তৈরি ২০১৮-এর এক প্রতিবেদনে সমালোচনা করা হয়েছে এ কারিকুলামের। কারিকুলামকে অপূর্ণ বলা হয়েছে। কারণ, এতে-

• হস্তমৈথুন সংক্রান্ত আলোচনা নেই।

• জেন্ডার আইডিন্টিটি (ট্রান্সজেন্ডারবাদ) সংক্রান্ত আলোচনা নেই।

• বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ে আলোচনা নেই।

ব্র্যাকের এই প্রতিবেদন অনুযায়ী এগুলোও পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করা দরকার।

২০২৩ সালে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউয়ের জন্য বিভিন্ন দেশি-বিদেশি এনজিও'র জমা দেওয়া প্রতিবেদনে পাঠ্যপুস্তকের এসব আলোচনার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আপত্তি এবং এর সাথে এলজিবিটি এজেন্ডার সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং সিএসই পাঠ্যক্রম কিছু বিরোধিতা এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। যেমন, সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের 'লিঙ্গ বৈচিত্র্য, লিঙ্গ পরিচয় এবং লিঙ্গ ভূমিকা' অংশের কিছু আলোচনা নিয়ে ইসলামপন্থী, রক্ষণশীল এবং সমাজের চরমপন্থী অংশগুলির দিক থেকে ব্যাপক বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যৌন শিক্ষার কিছু সেনসেটিভ বিষয়বস্তু (যেমন যৌন আনন্দ, সম্মতি, সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার এবং ট্রানজিশন ইত্যাদি) কিশোর-কিশোরীদের চিন্তাকে কলুষিত করছে।

এই বক্তব্যের দুটি দিক লক্ষণীয়।

• প্রথমত, তারা স্বীকার করছে এসব আলোচনার মাধ্যমে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ এলজিবিটি মতবাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

• দ্বিতীয়ত, এর বিরোধিতাকে তারা যুক্ত করেছে ইসলামপন্থা এবং চরমপন্থার সাথে। মানে আপনি যদি এলজিবিটি এজেন্ডার বিরোধিতা করেন, তাহলে আপনি চরমপন্থী!

প্রতিবেদনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশে এলজিবিটির বৈধতা ও সামাজিকীকরণের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে এবং এজন্যই শিক্ষাক্রমে যৌন শিক্ষা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে আলোচনা যুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের শেষে আবারও দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে এবং এলজিবিটিকে সামাজিক ও আইনি বৈধতা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটি তৈরিতে কাজ করেছে তিনটি আন্তর্জাতিক এনজিও-অ্যারো, রাইট হেয়ার রাইট নাও এবং সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ। আর বাংলাদেশ থেকে সাহায্য করেছে এবং এই প্রতিবেদনকে সমর্থন (এনডোর্স) করেছে, ব্র্যাক, নারীপক্ষ, নাগরিক উদ্যোগ, আরএইচএসটিইপি এবং অবয়ব। সবগুলো দেশি এনজিও। এর মধ্যে 'অবয়ব' হলো বয়েস অফ বাংলাদেশের নতুন নাম। বয়েস অফ বাংলাদেশ ২০১৮ সালের দিকে 'অবয়ব ডাইভার্সিটি সার্কেল' নামে কাজ শুরু করে।

৪.৯.৫ মিডিয়া

এসব কিছুর পাশাপাশি গত ২/৩ বছর ধরে মিডিয়াতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ এবং পরিচয়কে তুলে ধরা হচ্ছে ইতিবাচকভাবে। নিউজ মিডিয়াতে নিয়মিত আসছে নানা প্রতিবেদন। বিনোদন জগতের মাধ্যমেও প্রচারণা চালানো হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতে নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রানারআপও হয়েছে। নারী সাজা পুরুষদের অতিথি হিসেবে আনা হয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলের টকশোতে। তাদের মডেল বানিয়ে আলাদাভাবে নিউজ করা হয়েছে পত্রিকার ফ্যাশন সাময়িকীতে।

এ খবরগুলো দেখতে থাকলে যেকোনো মানুষের মনে হতে পারে, হয়তো আমাদের সমাজে দিন দিন 'ট্রান্সজেন্ডার' মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাই তাদের এত ঘনঘন, এত জায়গাতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা আসলে তা না। অল্প কিছু মানুষকে কৌশলে বারবার নানাভাবে মিডিয়াতে আনা হচ্ছে, যাতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা যায়। মিডিয়াতে আসা এই সব ব্যক্তিরা ঘুরেফিরে একই দাতা-এনজিও- অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের অংশ।

ব্র্যাকের গবেষকরা যেমন এলজিবিটি নিয়ে ইতিবাচক খবর প্রকাশের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিল, ঠিক একই পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে ট্র্যান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে ইতিবাচকভাবে লিখলেই 'পুরস্কার' পাচ্ছে সাংবাদিকরা।

এ কথার স্বীকৃতি এসেছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিজস্ব নথিপত্রে। বন্ধু'র ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, ৫৬ জন সাংবাদিককে 'মিডিয়া ফেলোশিপ' দিয়ে পুরস্কৃত করেছে তারা। এছাড়া একাধিক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে 'ট্র্যান্স টক' নামে অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছে বন্ধু। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে ট্রান্সজেন্ডারবাদের সামাজিকীকরণের কাজ। বন্ধুর ভাষ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মিডিয়া এলজিবিটি অধিকার সুরক্ষা এবং দাবি আদায়ের 'দক্ষ ওয়াচডগে' পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, দেশি মিডিয়া এলজিবিটি নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষিত কুকুরের মতো আচরণ করছে। এই দাবির সাথে দ্বিমত করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

***

শুরু থেকে বাংলাদেশে এলজিবিটি কার্যক্রম চলছে একটি পশ্চিমা প্রকল্প হিসেবে। যেখানে এনজিও-রা পশ্চিমাদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে কিছু সুবিধাবাদী মধ্যস্বত্বভোগী লোকজন, কিছু পশ্চিমা দালাল, কিছু সমকামী অ্যাকটিভিস্ট।

পশ্চিমাদের ফান্ডিং নিয়ে তাদের এনজিওগুলো কিছু 'গবেষণা' করেছে। পশ্চিমাদের দেওয়া অনুদানের টাকায় কিছু বিকৃতকামী লোকজন সংগঠন বানিয়ে ওয়ার্কশপ, ফ্যাশন শো টাইপের কিছু কাজ করেছে। আবার এগুলোর ছবি আর রিপোর্ট দেখিয়ে পশ্চিমারা দাবি করেছে 'বাংলাদেশের সমকামীরা অধিকার চায়'। এটা একটা চক্রাকার প্রক্রিয়া।

শত্রুপক্ষ জানে, রাতারাতি জনমত বদলে ফেলা যাবে না। সেটা তাদের উদ্দেশ্যও না। তাদের উদ্দেশ্য ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজের মূল্যবোধকে পালটে দেওয়া। হঠাৎ করে বড় পরিবর্তন সমাজে ওপর চাপিয়ে দিতে চাইলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে পরিবর্তনকে উপস্থাপন করা হয় তখন এক পর্যায়ে গিয়ে সমাজ তা মেনে নেয়। সবকিছু যদি এইভাবেই চলতে থাকে, তাহলে আমাদের জন্য

সামনে অপেক্ষা করছে অত্যন্ত অন্ধকার এক ভবিষ্যৎ। যা পশ্চিমে হয়েছে, তার সবকিছু আমাদের এখানেও হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ

৫.১ হযরত লুত আলাইহিস সালামের ঘটনা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনে কারিমে যে-সকল নবী-রাসুলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তাদের সংখ্যা প্রায় ২৫ জন। হযরত লুত আলাইহিস সালাম সেই তালিকায় স্থান পাওয়া একজন সম্মানিত পয়গম্বর। নিজ সম্প্রদায়ের সীমালঙ্ঘন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনার কারণে ইতিহাসে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত।

হযরত লুত আলাইহিস সালাম মূলত ইবরাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।' বাবেল শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন বাবেলে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেন, সেখানে হযরত লুতই কেবল ঈমান এনেছিলেন। পরবর্তী সময়ে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তাকে নিয়ে ফিলিস্তিনে বাইতুল মুকাদ্দিসের অদূরে কিনআন নামক এলাকায় হিজরত করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অতঃপর লুত তার প্রতি ঈমান আনল। ইবরাহিম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করছি। নিশ্চয়ই তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা আনকাবূত, আয়াত: ২৬

সেখানে থাকাকালেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত লুত আলাইহিস সালামকে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং জর্ডান ও বাইতুল মুকাদ্দিসের মধ্যবর্তী কয়েকটি শহরের জন্য হিদায়াতের বাণী প্রচারক হিসেবে তাকে প্রেরণ করেন। হযরত লুত

আলাইহিস সালামকে মোট কয়টি শহরের জন্য পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেগুলোর নাম কী, এ-বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

নবী লুত আলাইহিস সালামের দাওয়াতি মিশনের প্রধান কেন্দ্র ছিল সাদুম শহর বা সাদুম সম্প্রদায়। বাকিগুলোর নাম সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, আমুদ আক্রম সাউর ও সাকুর। আবার কেউ কেউ বলেন, আমুরা দুমা সাবাহ ও সাওয়াহ।

যা হোক, মোট পাঁচটি শহর, যার পুরোটা জুড়েই ছিল হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এর দাওয়াতি কাজের যিম্মাদারি এবং এই পাঁচ শহরের মানুষের মধ্যেই ছিল ভয়াবহ এক ব্যাধি।

সাদুম শহরকে আশপাশের এলাকার রাজধানী ধরা হতো। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এই শহরগুলোর সমষ্টিকে মু'তাফিকাহ বা মু'তাফিকাত নামে অভিহিত করা হয়েছে।'

উপরে উল্লেখিত নামগুলো সূরা নজমের ৫৩ নং, সূরা তাওবার ৭০ নং এবং সূরা হাক্কাহ এর ৯ নং আয়াত এ রয়েছে।

যার অর্থ 'জনপদ উলটানো শহরগুলো'। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঐ সম্প্রদায়ের গুনাহের কারণে তাদের শহরগুলোকে উলটে দিয়ে ধ্বংস করে দেন। মানবজাতির শিক্ষার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা হযরত লুত আলাইহিস সালাম- এর সম্প্রদায়ের আবাসস্থলকে 'উলটানো জনপদ বা শহর' নামে নামকরণ করেছেন। অথচ ভৌগোলিক বিচারে সেগুলো ছিল অন্যান্য শহর থেকে অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধ। সাদুমবাসীর জন্য আল্লাহ স্বীয় নিয়ামতের ভান্ডার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা শুকরিয়া আদায় না করে কুফুরি করে এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসে এতটা মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালো-মন্দের স্বভাবজাত বোধটুকুও হারিয়ে ফেলে।

হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এর উপদেশবাণী এবং ভীতিপ্রদর্শন তাদের হৃদয়ে কোনো রেখাপাত করেনি। উপরন্তু তারা নিজেদের নবীকেই শহর থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেয় এবং বলে,

তোমার প্রতিশ্রুত আযাব এনে দেখাও, যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৫.২ মানবইতিহাসে সমকামিতার উদ্ভব

বনি আদমের জীবনধারায় সমকামিতার অনুপ্রবেশ কবে থেকে শুরু হয়েছে, এ নিয়ে রয়েছে অনেক মতভেদ ও মতপার্থক্য। মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতিকে ইহ-পরকালীন সফলতার পথ যেমন দেখিয়েছে, সেই সাথে মানবেতিহাসের এমন কিছু রহস্যকে উন্মোচিত করেছে, যে-সম্পর্কে ইতিপূর্বে কারও কিছু জানা ছিল না।

উল্লিখিত মতভেদ ও তর্কবিতর্কের ইতি টেনে পবিত্র কুরআনুল কারিম বলছে,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۞

এবং লুতকে (পাঠালাম)। যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে সারা বিশ্বে কেউ করেনি?'

সূরা আরাফ, আয়াত:৮০

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়ের অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম তারাই এই জঘন্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনের প্রায় **১৯**টি সুরার **১০১**টি আয়াতে তাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

একস্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۞

তোমরা কামেচ্ছা পূরণের জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে গিয়ে থাকো; বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। সূরা আরাফ, আয়াত : ৮১

তাফসিরে ইবনে কাসির থেকে বর্ণিত - মুফাসসিরিন এ-ব্যাপারে একমত যে, সমকামিতার উদ্ভব ঘটায় হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায়। ইবনে কাসির, (৬/২৫৯)।

কিয়ামত পর্যন্ত যারা এই সর্ববিধ্বংসী গুনাহে লিপ্ত হবে, তাদের গুনাহের ভার ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের হিসেবেও যুক্ত হবে।

৫.৩ যেভাবে উদ্ভব ঘটল এই ব্যাধির

ইমাম আলুসী রহ. উল্লেখ করেন: [৫৯]

হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায় শ্যামলিমায় ঘেরা একটি ভূখণ্ডে বসবাস করত। যার চতুর্দিকে ছিল সব রকম ফুল-ফল ও শস্যের প্রাচুর্য। তারা দিন-রাত সেগুলোর চাষবাসে ব্যস্ত থাকত।

ইবলীস একদিন সুশ্রী তরুণের বেশ ধরে এক কৃষকের সামনে এলো এবং বলল, 'আমি কি তোমাকে এমন কাজের খবর দেব না, যাতে তুমি অনেক আনন্দ পাবে?' শয়তান ঐ কৃষকের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়। এরপর থেকে রাস্তার মোড়ে ইবলীস শয়তান সুশ্রী তরুণের বেশ ধরে বসে থাকত এবং পথচারী মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এই কাজে লিপ্ত করে ফেলত।

এভাবে কিছু দিন যাওয়ার পর শয়তান যখন বুঝতে পারল, এখন তারা নিজেরাই এতে জড়িয়ে পড়বে, তখনই সে উধাও হয়ে গেল। এভাবেই ব্যক্তি থেকে সমাজে এবং সবখানে এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে হিদায়াতের বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে হযরত লুত আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে লুত আলাইহিস সালামকে তাদের ভাই বলা হলেও সেখানে তিনি মুহাজির ছিলেন। নবী ও উম্মতের সম্পর্কের কারণেই তাঁকে তাদের ভাই বলা হয়েছে।

এই সম্প্রদায়ের ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের যেই শিক্ষা দান করতে চেয়েছেন, কুরআনের সরাসরি বিবরণ থেকেই তা বুঝে আসে।

পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট এবং ভীষণ হঠকারী এক কওমের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত লুত আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনি প্রথমে তাদের তাওহীদের দাওয়াত প্রদান করেন এবং বলেন, 'আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নবী হিসেবে আমার অনুসরণ করো।'

তারপর তিনি তাদের অসংখ্য পাপকর্মের মধ্য থেকে প্রধান তিনটি বিষয় সম্পর্কে তাদের সাবধান করেন:

১. সমকামিতা।

২. রাহাজানি।

৩. প্রকাশ্য বিভিন্ন মজলিসে অশ্লীলতার চর্চা।'

সূরা আনকাবুত, আয়াত: ২৯

হযরত লুত আলাইহিস সালাম তাদের বারবার সাবধান করার পরও যখন তারা ফিরে এলো না, নিজেদের হঠকারিতায় অনড় রইল, তখনই নেমে এলো ভয়াবহ আসমানি আযাব।

আল্লাহর হুকুমে হযরত লুত ও তাঁর সাথীগণ নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলেন। তারপর হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ামাত্র সুবহে সাদিকের সময় প্রচণ্ড নিনাদ তথা বিকট আওয়াজের সাথে তাদের শহরগুলোকে উপরে উঠিয়ে উপুড় করে মাটির দিকে ছুড়ে মারেন। সাথে সাথে শুরু হলো প্রবল ঘূর্ণিবায়ু এবং প্রস্তরবর্ষণ।

পবিত্র কুরআনে তার বর্ণনা এসেছে এইভাবে,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

অবশেষে যখন আমাদের হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমরা উক্ত জনপদের উপরকে নিচে করে দিলাম এবং তার উপরে ক্রমাগত ধারায় মেটেল প্রস্তর বর্ষণ করলাম। যার প্রতিটি তোমার প্রভুর নিকটে চিহ্নিত ছিল। আর ঐ ধ্বংসস্থলটি যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়।'

সূরা হুদ, আয়াত: ৮২-৮৩

বস্তুত, এটা ছিল তাদের কুকর্মের উপযুক্ত শাস্তি। তারা যেমন আল্লাহর আইন ও বিধানকে উলটে দিয়েছিল, অর্থাৎ স্ত্রীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তাদেরও উলটে দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।

বাইবেলে সাদুম শহরকে এই জাতির কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে। মৃত সাগরের (Dead sea) নিকটবর্তী কোথাও এই শহরের অবস্থান ছিল। মৃত সাগর আজও অভিশপ্ত সেই জাতির ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে। এটি 'লুত সাগর' নামেও পরিচিত। কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্র্যান্সজর্ডান বলা হয়, মূলত সেখানেই ছিল হযরত লুত আলাইহিস সালাম-এর জাতির বসবাস।

৫.৪ কুরআনের ভাষায় মানবজাতির অবস্থান

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। যেখানে রয়েছে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের যাবতীয় সমস্যার কুরআন, সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত ও শরয়ি কিয়াস-ভিত্তিক সুবিন্যস্ত সিদ্ধান্তমূলক সমাধান। শুধু মুসলিম কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের জন্যই নয়, বরং গোটা পৃথিবীর বিচরণশীল প্রতিটি সৃষ্টিজীবের জন্য রয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ের সুশৃঙ্খল নীতিমালা।

মানবজাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৭০

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

‘আমি অবশ্যই আদম-সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি। জলে-স্থলে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি। আর আমি অন্য যত কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের উপরই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র আদম-সন্তানের অস্তিত্ব থেকে মৃত্যু পরবর্তী জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ। কুরআনে কারিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

মানুষের ওপর কখনও এমন সময় অতিবাহিত হয়েছে কি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তু ছিল না? আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। তারপর তাকে বানিয়েছি শ্রবণকারী ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।' সূরা দাহর, আয়াত: ১-২

মানুষ সৃষ্টির প্রথম ধাপ হলো শুক্রাণু, কুরআনের ভাষায় যাকে 'নুতফা' বলা হয়েছে। সেই 'নুতফা' থেকে কী সৃষ্টি হবে, তা কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই ভালো জানেন। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ

নিশ্চয়ই কিয়ামত (-এর ক্ষণ) সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। একমাত্র তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কী আছে? সূরা লুকমান, আয়াত: ৩৪

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন মানুষকে কীভাবে অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন এবং তারপর পর্যায়ক্রমে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছান তার বিবরণও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

'হে মানুষ, পুনরায় জীবিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে, তবে (একটু চিন্তা করো,) আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, তারপর এক মাংসপিণ্ড থেকে, যা (কখনও) পূর্ণাকৃতি হয় এবং (কখনও) পূর্ণাকৃতি হয় না, তোমাদের কাছে (তোমাদের) প্রকৃত অবস্থা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি (তোমাদের) যতকাল ইচ্ছা মাতৃগর্ভে রাখি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। তারপর তোমাদের শিশুরূপে বের করি। তারপর (তোমাদের প্রতিপালন করি) যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের কতককে (আগেই) দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তোমাদের কতককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় হীনতম বয়সে (অর্থাৎ চরম বার্ধক্যে), এমনকি তখন সে সব কিছু জানার পরও যেন কিছুই জানে না...।' সূরা হজ্জ, আয়াত: ৫

সৃষ্টির ইতিহাসের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে মানুষের সৃষ্টিতে মোট চারটি ধারা দেখা যায়:

১. সরাসরি মাটি থেকে, পিতা ও মাতা ছাড়া। অর্থাৎ, হযরত আদম আলাইহিস সালাম।

২. শুধু পুরুষ থেকে। অর্থাৎ, মা হাওয়া আলাইহাস সালাম।

৩. শুধু নারী থেকে। অর্থাৎ, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম।

৪. নারী পুরুষ উভয় থেকে। যেই পদ্ধতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ রাখবেন। এর ব্যতিক্রম কখনোই হবে না (একমাত্র আল্লাহর কুদরত ছাড়া)।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষকে খুবই মর্যদাবান করে সৃষ্টি করেছেন এবং নারীপুরুষের প্রশান্তির জন্যই মূলত সৃষ্টির ক্ষেত্রে চতুর্থ ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন।

অবশ্য কারও মনে হতে পারে, অথবা কোনো মানুষ ভাবতে পারেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কেবল মানুষের দৈহিক গঠন বানিয়ে দিয়েছেন। ব্যস, এতটুকুই স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের প্রাপ্তি। তারপর মানুষ সামাজিক ব্যবস্থা আবিষ্কার করেছে এবং বলেছে, নির্ধারিত দৈহিক গঠনে লিঙ্গ নির্ণয় হবে। যার চুল লম্বা থাকবে, বুকে স্তন এবং যোনিপথ থাকবে এবং নিয়মিত যার হায়েয হবে, সে স্ত্রী লিঙ্গ বা নারী। আর এগুলো যার থাকবে না, বরং যৌনাঙ্গ থাকবে, সে পুং লিঙ্গ বা পুরুষ। এই নির্ণয় সর্বজনীন নয়; বরং তা মানুষ ও সমাজের নিছক আবিষ্কারমাত্র। যার ইচ্ছা সে এই আবিষ্কার অনুযায়ী চলবে, আর যাদের ইচ্ছা হবে না, তাকে কেউ বাধ্য করতে পারবে না।

৫.৫ ট্রান্সজেন্ডারিজমের শরয়ি বিধান

মনে রাখতে হবে, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদে লিঙ্গনির্ণয়ের মানদণ্ড হলো 'মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ' বা 'নিজেকে ভিন্ন লিঙ্গের মনে হওয়া'। যা বাস্তবতায় রূপ পায় 'হরমোন থেরাপি কিংবা সার্জারি'র মাধ্যমে। পক্ষান্তরে ইসলামি শরিয়ত-মতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত জন্মগত লিঙ্গই নারীপুরুষের পরিচয় নির্ণয়ের সঠিক মাধ্যম।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টির সূচনাতেই 'নুতফা' (মাতৃগর্ভে অবস্থিত বীর্য)-কে নর-নারী যুগলে সৃষ্টি করে জেন্ডার বা লিঙ্গ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা জন্মের পরে 'ট্র্যান্স' করা নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই 'নুতফা'কে পুরুষ বানিয়েছেন, তাকে পুরুষের মন-মানসিকতা দিয়েছেন। আর যেই 'নুতফা'কে নারী বানিয়েছেন, তাকে নারীর মন-মানসিকতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍ يُمْنَى) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.

'সে কি ছিল না এক বিন্দু বীর্য, যা মাতৃগর্ভে স্খলিত করা হয়? তারপর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, তারপর আল্লাহ তাকে মানব-রূপ দান করেছেন ও তাকে সুঠাম করেছেন। তা ছাড়া তা দ্বারাই তিনি নর- নারীর যুগল সৃষ্টি করেছেন।' সূরা কিয়ামাহ, আয়াত: ৩৬-৪০

আরেক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

এবং (শপথ) সেই সত্তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।' সূরা লাইল, আয়াত: ৩

অতএব, মানুষের নারী বা পুরুষ হওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়, যা নির্ধারিত হয় মাতৃগর্ভে। মানুষ চাইলেই পরবর্তী সময়ে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না, এর অধিকারও রাখে না।

যেই পুরুষ নিজেকে মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধের ভিত্তিতে নারী ভাবে কিংবা যেই নারী নিজেকে পুরুষ হিসেবে চিন্তা করে, তার ব্যাপারে হাদিস শরিফে অভিসম্পাতের কথা বর্ণিত হয়েছে,

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশ ধারণকারিণী নারীর ওপর অভিসম্পাৎ করেছেন এবং বলেছেন, তাদের বের করে দাও তোমাদের ঘর থেকে। আর উমর রা. অমুক অমুককে (তাদের ঘর থেকে) বের করে দিয়েছেন।

সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৮৩৪

সুতরাং ট্রান্সজেন্ডারিজম একটি অভিশপ্ত, খোদাদ্রোহী এবং বিকৃত মানসিকতার মতবাদ, যা ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র আইন ও ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপূর্ণ ধ্বংস কামনা করে। অতএব এ-ধরনের মতবাদ বিশ্বাস করা বা গ্রহণ করা কিংবা সমর্থন করা হারাম এবং নাজায়েয।

কেউ যদি এ-ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে এবং নিজেকে ট্রান্ডজেন্ডার দাবি করে, তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে খালেস দিলে তাওবা- ইসতিগফার করে দ্রুত নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা জরুরি।

৫.৬ ট্র্যান্সজেন্ডারিজম কি বিশ্বাস করার মত মতবাদ?

ট্রান্সজেন্ডারিজম মূলত এমন চিন্তা, এটা যতটা না বৈচিত্র্যময়, তার চেয়ে বেশি কুৎসিত ও বিদঘুটে। প্রথম শোনার পর কেউ বিশ্বাসই করতে পারে না যে, আদৌ এমন কোনো মতবাদ থাকতে পারে? তাই অনেকেই মনে করতে পারেন, হয়তো বা কোনো কারণে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে! বা এটা তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন! কিংবা এটা মানবিক বিবেচনা ও অধিকারের বিষয়! অথবা লিঙ্গবৈচিত্র্য জনগোষ্ঠীর পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মানবতার আন্দোলন!

আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রমোট করা হলেও তার না আছে বাস্তবসম্মত কোনো আদর্শ, না আছে স্থায়ী কোনো রূপরেখা, আর না আছে কল্যাণমুখী সুস্থ কোনো ভবিষ্যত-পরিকল্পনা।

এ-যাবৎ আমাদের দেশে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে যতগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা সম্প্রচারিত হয়েছে, সেগুলোতে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, কোথাও হয়তো অস্ত্রোপচার করে নিজেকে পুরুষ থেকে নারী দাবি করার চেষ্টা করা হয়েছে, কোথাও অস্ত্রোপচার ছাড়াই শুধু 'মনে হওয়া'র ভিত্তিতে নিজেকে ভিন্ন লিঙ্গের দাবি করা হয়েছে।

মজার বিষয় হলো, এই মতবাদ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ সৃষ্টির খোদায়ি নিযাম যেমন ছিল, মতবাদ আসার পরও তার প্রকৃতি ঠিক তেমনই প্রকাশিত হচ্ছে। মাঝে শুধুই অহেতুক কিছু দাবি যুক্তি অসুস্থ মানসিকতা আর পরিবেশ দূষণ ছাড়া সুস্থ ফলপ্রসূ আদর্শিক কোনো লক্ষ্য নেই।

যারা ভয়ংকর এই আন্দোলন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এত সরব, তারা নিজেরাই যদি একটু চিন্তা করে যে, তাদের পিতামাতা বা পূর্বপুরুষেরা যদি এল জি বি টি-র সদস্য হতো বা ট্রান্সজেন্ডারিজমে বিশ্বাসী হতো, তবে কি তারা পৃথিবীতে আসতে পারত?

সামান্য চিন্তার মাধ্যমেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব। ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু।

আল্লাহ সুবহানওয়া তা'আলা আমাদের এই সকল ভয়ংকর ফিতনা থেকে হিফাজত করুন। সমাজে ট্রান্সজেন্ডার বিষয় নিয়ে সবাইকে সচেতন হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

১। ১.১ এর কনটেন্ট সোর্স উইকিপিডিয়া

২। Sex Laws and Sexuality Rights in Comparative and Global Perspectives | Annual Review of Law and Social Science. https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-lawsocs- CI-102612-134007#_i2 (accessed March 7, 2023).

৩। ১.২ থেকে ১.৫ এর কনটেন্ট সোর্স উইকিপিডিয়া এবং বই- ট্রান্সজেন্ডারিজম (মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ)

৪। ২.১ থেকে ২.৩ এর কনটেন্ট সোর্স বই - অবক্ষয়কাল (আসিফ আদনান)

৫। Christian Hamburger, "Endocrine Treatment of Male and Female Transsexualism," in Green and Money, Transsexualism, p. 291

৬। Socarides, Charles W Beyond sexual freedom. Quadrangle/The New York Times Book Company, 1975 p 130

৭। Bellinger, Creighton G., and Dicran Goulian. "Secondary surgery in transsexuals." Plastic and Reconstructive Surgery 51, по. 6 (1973): 628-631

৮। Doctors Admit Link Between Transgender Hormone Therapy And Cancer In Leaked Emails. The Telegraph. March 5, 2024 https://tinyurl.com/yc3tmthe

৯। James, Sandy, Jody Herman, Susan Rankın, Mara Keisling, Lisa Mottet, and Ma'ayan Anafi. "The report of the 2015 US transgender

survey" (2016). 99,100.cNolan, Ian T., Christopher J. Kuhner, and Geolanı W Dy "Demographic and temporal trends in transgender identities and gender confirming surgery" Translational andrology and urology 8, no. 3 (2019): 184

১০। Cohn, J "The Detransition Rate Is Unknown." Archives of Sexual Behavior (2023): 1-16. Transgender detransition is a taboo topic, but data shows it's on the rise, Big Think - https://bigthink.com/health/transgender-detransition/

১১। "The Three Kings: Harry Benjamin, John Money, Robert Stoller," Archives of Sexual Behavior 38:4 (August 2009), 610-613

১২। The Sexes: Prisoners of Sex," Time, January 21, 1974, 64.

১৩। সে ভুল করে মেয়ে হয়ে গিয়েছে, যা বললেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, দৈনিক কালবেলা, ২৬ জানুয়ারি ২০২৪/ https://www.kalbela.com/video-gallery/news/1433

১৪। নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে, দৈনিক প্রথম আলো, সেপ্টেম্বর ১৯, ২০২৩। https://www.prothomalo.com/bangladesh/gloz3nhb5b

১৫। Lexico, "Gender" https://www.lexico.com/definition/gender

১৬। Haig, David "The inexorable rise of gender and the decline of sex. Social change in academic titles, 1945-2001 "Archives of sexual behavior 33 (2004): 87-96.

১৭। J Money, "An Examination of Some Basic Sexual Concepts: The Evidence of Human Hermaphroditism," Bulletin of Johns Hopkins Hospital 97:4 (October, 1955), 301-319

১৮। John Money, preface, in John Money & A A Ehrhardt, Man and Woman, Boy and Girl Gender Identity from Conception to Maturity (Northvale, NJ Jason Aronson, 1972).

১৯। Katrina Karkazıs, Fixing Sex Intersex, Medical Authority, and Lived Experience (Durham, NC, 2008) Robert J. Stoller, Sex and Gender On the Development of Masculinity and Femininity (New York, 1968), chs. 5-7

২০। টাইম ম্যাগাজিন, জানুয়ারি ৮, ১৯৭৩ সংখ্যা।

২১। Colapinto, John. As nature made him: The boy who was raised as a girl. HarperCollins Publishers. 2000

২২। Diamond, Milton, and H Keith Sigmundson. "Sex reassignment at birth Long- term review and clinical implications." Archives of pediatrics & adolescent medicine 151. пo 3 (1997): 298-304. Colapinto. As Nature Made Him Money, Dr "the Boy with No Penis." BBC https://tinyurl.com/2s3vvz7u

২৩। Downing, Lisa, iain Morland, and Nikkı Sullivan. Fuckology critical essays on John Money's diagnostic concepts. University of Chicago Press, 2019 [৩১৮] শরীরের কোনো অঙ্গ বা অংশ কেটে ফেলা নিয়ে যৌন ফ্যান্টাসি বা

যাদের শরীরের কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে তাদের নিয়ে ফ্যান্টাসি করার মাধ্যমে যৌন আনন্দ লাভ করা।

২৪। Colapinto. As Nature Made Him quoting, The Winnipeg Free-Press, Students, Mds Debating Worth Of Sex Exercise and Moral Values Of Lecturers Questioned

২৫। Highleyman, Liz. Sex researcher John Money dies. The Bay Area reporter, 2006. https://www.ebar.com/story.php?ch=news&id=237195

২৬। "A childhood sexual experience, such as being the partner of a relative or of an older person, need not necessarily affect the child adversely" ATTACKING THE LAST TABOO (Time Magazine, April 14, 1980.)]

২৭। Interview John Money PAIDIKA The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol 2, no. 3, p. 5.

২৮। Interview John Money PAIDIKA The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol 2, no. 3, p. 5

২৯। Abuse and Neglect of Children at Home (Baltimore The Johns Hopkins University Press, 1980), p. 412

৩০। Colapinto. As Nature Made Him Quoting, The Winnipeg Free-Press, Students, Mds Debating Worth Of Sex Exercise and Moral Values Of Lecturers Questioned.

৩১। Goldie, Terry The man who invented gender engaging the ideas of John Money UBC Press 2014

৩২। 'বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা?", আসিফ আদনান। https://chintaporadh.com/behind-the-curtain

৩৩। Remembering Shivananda Khan, APCOM's founder on Human Rights Day, Dennis

৩৪। NAZ Org, UK. https://www.naz.org.uk/who-we-are# QueerBio.com. Shivananda Khan

৩৫। Bandhu Social Welfare Society, About Us. https://www.bandhu-bd.org/about-bandhu (Accessed, Jan 15, 2024) Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Annual Report 2021, p. 10

৩৬। Hossain, A. "Bangladesh. Review of LGBT situation in Bangladesh." The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide (2010): 333-346.

৩৭। BSWS, About Us. Ashoka Org. Shale Ahmed. https://www.ashoka.org/en-sg/ fellow/shale-ahmed

Bangladeshi MSM activist awarded Ashoka Fellowship. The Daily Star March, 2009 https://www.thedailystar.net/news-detail-80569

৩৮। Ashoka Org. Shale Ahmed.

৩৯। Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J Asian L. 20 (2019): 115.сараншиний

৪০। Adnan. Section 377.

৪১। Adnan. Section 377.

৪২। Rashid, Sabina Faiz, Hilary Standing, Mahrukh Mohiuddin, and Farah Mahjabeen Ahmed. "Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh." Health Research Policy and Systems 9, no. 1 (2011): 1-9

৪৩। Ibid, p 4

৪৪। Gov.uk. Summary Report: Sexuality and Rights Workshop, January 2007 https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/summary-report-sexuality-and-rights-workshop-january-2007

৪৫। Ibid, p 4

৪৬। আইডাব্লিউএইচসি'র প্রতিষ্ঠাতা দুইজন। জোঅ্যান ডানলপ (Joan Dunlop) এবং অ্যাড্রিয়েন জার্মেইন (Adrienne Germain)। প্রথম জন এই প্রতিষ্ঠান শুরুর আগে রকাফেলার ফাউন্ডেশনে কাজ করত। দ্বিতীয় জন কাজ করতো ফোর্ড ফাউন্ডেশনে। আইডাব্লিউএইচসি বিভিন্ন সময়ে রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানও পেয়েছে। দেখুন, Ford Foundation, Grants Database, https://tinyurl. com/3ve8vdnb

৪৭। Rashid et al. Creating. P4

৪৮। Ibid, p 7

৪৯। Ibid, p 5

৫০। Ibid, p 7

৫১। Brac Uni to be an early recipient from Soros's $1 billion fund. The Business Standard, January 28, 2020 https.//tinyurl.com/2s4xhdz6

৫২। BoB website (now defunct). History of the E-Groups and BoB's Evolution. Accessed through Wayback Machine, https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history of_e-group.html (Accessed, Jan 15, 2024)

৫৩। BoB website (now defunct). Our History. Accessed through Wayback Machine, https://web.archive.org/web/20240123165703/http://www.boysofbangladesh.org/

৫৪। Sexual Rights Initiative. "Report on Bangladesh-4th Round of the Universal Periodic Review-February 2009" (2009). BoB website (now defunct). Our History

৫৫। Bangladesh Refuses To Abolish Crımınalisation Of Consensual Same-Sex Ties, DNA November 21, 2013. https://tinyurl.com/mrusjmvh

৫৬। ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা ২৪, মার্চ ১০, ২০২২

৫৭। দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা। খসড়া চূড়ান্ত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুরক্ষা আইন, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩

https://www.ittefaq.com.bd/669275/সম্পত্তিতে-অধিকার পাবে-ট্রান্স-জেন্ডার-সন্তানরা

৫৮। Bandhu Annual Report 2022, Note from Chairperson and Executive Director, p6

৫৯। তাফসিরে রুহুল মাআনী, ৪/২৫২

(এছাড়া সবশেষে ইসলামের ভিত্তিতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ এর অংশগুলো নেয়া হয়েছে বই- **ট্রান্সজেন্ডারিজম** তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, শরয়ী নির্দেশনা - লেখক মুফতি খালেদ সাইফুল্লাহ)